পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

ভিকারুন নেছা

এম.ফিল. গবেষক

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৫-৯৬

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

400422

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

এম সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library

400422

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

M.Phil.

400422

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

GIFT

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

ভিকারুন নেছা

400422

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা ও মা

আলহাজ্ব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঁইয়া

ও

বেগম জাহানারা ভূঁইয়া

400422

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম, আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম,ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

ঢাকা

তারিখ : ০৮/০৪/২০০২

ভিকারুন নেছা

এম, ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য ভিকারুন নেছা কর্তৃক রচিত, "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি।

এম, সাইফুল্লাহ ভুঁইয়া

তারিখ : ৮/০৪/২০০২ ইং

এম সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র

প্রথম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব।

১.১ ভূমিকা	১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা	২
১.৩ গবেষণার পদ্ধতি	৩
১.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিগত বিবরণ, অবস্থান, আয়তন, সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণি, প্রশাসনিক পটভূমি, জেলা পরিচিতি।	৪-১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমির বিবরণ

২.১ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি	১২-১৪
২.২ পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি	১৪-১৬
২.৩ ভূমির প্যাটার্ণ এবং মালিকানার ধরণ	১৬-১৭
২.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব	১৮
২.৫ বিভিন্ন সরকারের নীতি নির্ধারণের ঐতিহাসিক পটভূমি	১৮
২.৬ সুলতানী আমল	১৯
২.৭ শেরশাহ ও মোগল আমল	২০
২.৮ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল	২১-২২
২.৯ বৃটিশ আমল	২২-২৩
২.১০ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং এর কার্যকারিতা	২৪-২৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তার ১৯৪৭-৭১

৩.১ পাকিস্তান আমল	২৯-৩১
৩.২ সমস্যার নতুন মাত্রা : কাপ্তাই বাঁধ	৩২-৩৪
৩.৩ বাংলাদেশ আমল : মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবের শাসনকাল (১৯৭২-৭৫)	৩৫-৪৩
৩.৪ জিয়া সরকারের আমল (১৯৭৫-৮১)	৪৪-৪৮
৩.৫ প্রেসিডেন্ট সাত্তারের শাসনামল (১৯৮১-৮২)	৪৯
৩.৬ জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০)	৫০-৫৪
৩.৭ '৯০ এর গণ অভ্যুত্থান ও পরবর্তী পরিস্থিতি	৫৫
৩.৮ বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমল (১৯৯১-৯৬)	৫৬-৫৭

চতুর্থ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে গৃহীত উদ্যোগ

৪.১ শেখ মুজিব প্রশাসন	৫৯-৬২
৪.২ জিয়া সরকার	৬৩-৬৫
৪.৩ প্রেসিডেন্ট সাত্তারের শাসনামল	৬৬
৪.৪ এরশাদ প্রশাসন	৬৭-৭২
৪.৫ খালেদা জিয়া সরকারের সময়কাল	৭৩-৭৪
৪.৬ সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা ও প্রস্তাব	৭৫
৪.৭ এরশাদ প্রশাসন	৭৫
৪.৮ খালেদা জিয়া প্রশাসন	৭৬
৪.৯ শেখ হাসিনার সরকারের আমল	৭৭
৪.১০ শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯৬ জুলাই- ২০০১)	৭৮-৭৯
৪.১১ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।	৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বিবরণ।

৫.১ (ক) সাধারণ ৮৩
৫.২ (খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ ৮৪-৯২
৫.৩ (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ৯৩-৯৬
৫.৪ (ঘ) পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী ৯৭-১০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

৬.১ ক্ষমতায়নে পরিবর্তন ১০৪
৬.২ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও সুবিধা ১০৪-১০৫
৬.৩ আইন সংক্রান্ত সুবিধা ও ক্ষমতা ১০৫
৬.৪ করারোপ ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ও সুবিধা ১০৫
৬.৫ ভূমি কমিশন গঠন ও এর ক্ষমতা ও সুবিধা ১০৫-১০৬
৬.৬ কোটা ও বৃত্তি সংক্রান্ত সুবিধা ১০৭
৬.৭ আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১০৭-১০৮
৬.৮ উপজাতীয়দের উন্নয়ন ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে ১০৯
৬.৯ শরনার্থী সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে ১০৯
৬.১০ সামাজিক ক্ষেত্রে ১০৯
৬.১১ শিক্ষা ক্ষেত্রে ১১০
৬.১২ সামরিক নেটওয়ার্ক ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা হয়েছে ১১০
৬.১৩ কৃষ্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ১১০
৬.১৪ শান্তি চুক্তির নেতিবাচক দিক ১১১-১১২
৬.১৫ পার্বত্য উপজাতীয়দের প্রতিক্রিয়া ১১৩
৬.১৬ পাহাড়ী বাঙ্গালীদের প্রতিক্রিয়া ১১৪
৬.১৭ আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া ১১৪
৬.১৮ আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ১১৪
৬.১৯ আওয়ামী লীগ সমর্থিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া ১১৪-১১৫
৬.২০ বি.এন.পির প্রতিক্রিয়া ১১৫
৬.২১ বি.এন.পি সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার	১১৬-১২০
তথ্যপঞ্জী	(i-x)
সহায়ক গ্রন্থাবলী	(xi-xiii)
পরিশিষ্ট - ১ (চুক্তি পরবর্তী আইন প্রণয়ন ও সংশোধন)	(xiv)
পরিশিষ্ট - ২ (উপজাতি অ-উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার)	(xv)
পরিশিষ্ট - ৩ (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আর্থ-সামাজিক প্রকল্প ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ১৯৯০-৯১)	(xvi)
পরিশিষ্ট - ৪ (বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিন্যাস)	(xvii)

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট দীর্ঘদিনের। এই সমস্য নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে ইস্যুটির রাজনৈতিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টিও সুধী সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে পার্বত্যবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে গবেষণার চেয়ে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের মতামতই বেশী প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা ছাড়া কোন বিষয়ের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। তাই সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামতের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

এই গবেষণা কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আমি বেশ তথ্য সংকট ও পুস্তকের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেছি। তাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে আমাকে মত বিনিময় করতে হয়েছে দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দের সাথে। তাই গবেষণার ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাছাড়া আমার এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী। গবেষণা কার্যটিকে সহজতর করার জন্য আমার যে সকল সুহৃদ বন্ধু-বান্ধব আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। গবেষণার ব্যাপারে যার কৃতিত্ব সর্বাধিক তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সাইফুল্লাহ ভূইয়া। তিনি আমার গবেষণা কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে আমার কাজকে সহজতর করেছেন। গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি। এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মঞ্জুর আলম। আমার ভালো কিছুতে তাঁর সবচেয়ে বেশী আনন্দের সঞ্চার হয়। শ্রদ্ধা তাঁকে।

Dhaka University Institutional Repository

কম্পিউটার ও বাঁধাই কাজে সহযোগিতা করে আমাকে ঋণী করেছেন শুভানুধ্যায়ী জনাব ফিরোজ আলম ভূঁইয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ১ম পর্বের চারটি বিষয়ের উপর আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও ক্লাস নিয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ এম. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ডঃ নাজমা চৌধুরী, ডঃ হারুন-অর রশিদ এই চারজন অভিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের সস্নেহ সহায়তার জন্যই টেক্সসমূহের অধ্যায়গুলো অত্যন্ত সহজে আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমি যাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে সুপরামর্শ এবং সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবার নাম এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হল না, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। পরিশেষে বাংলাদেশের সুধীমহলে আমার গবেষণা কর্মটি আদৃত হলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে- এই প্রত্যাশা।

ভিকারুন নেছা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

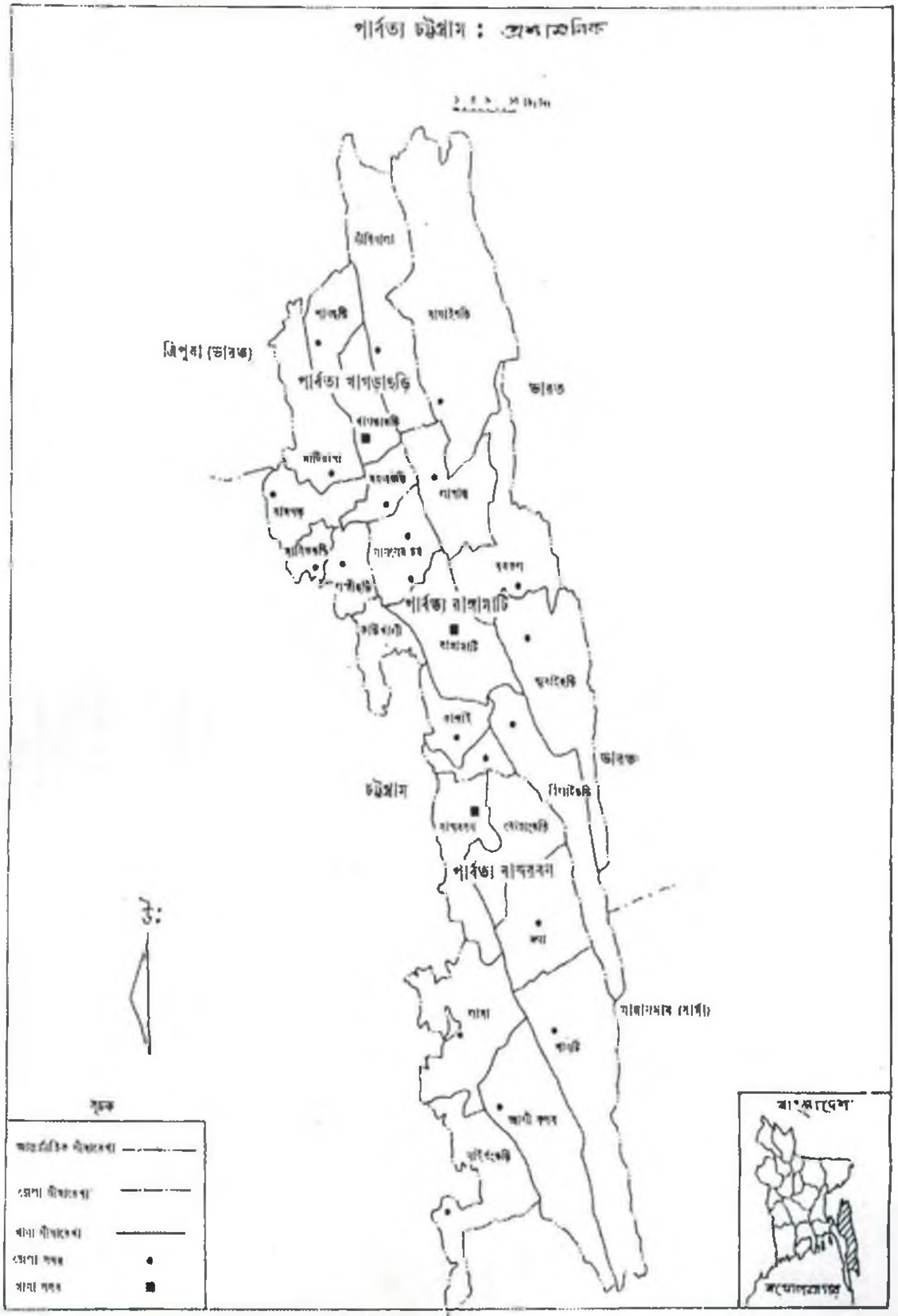

মানচিত্র-২

Dhaka University Institutional Repository

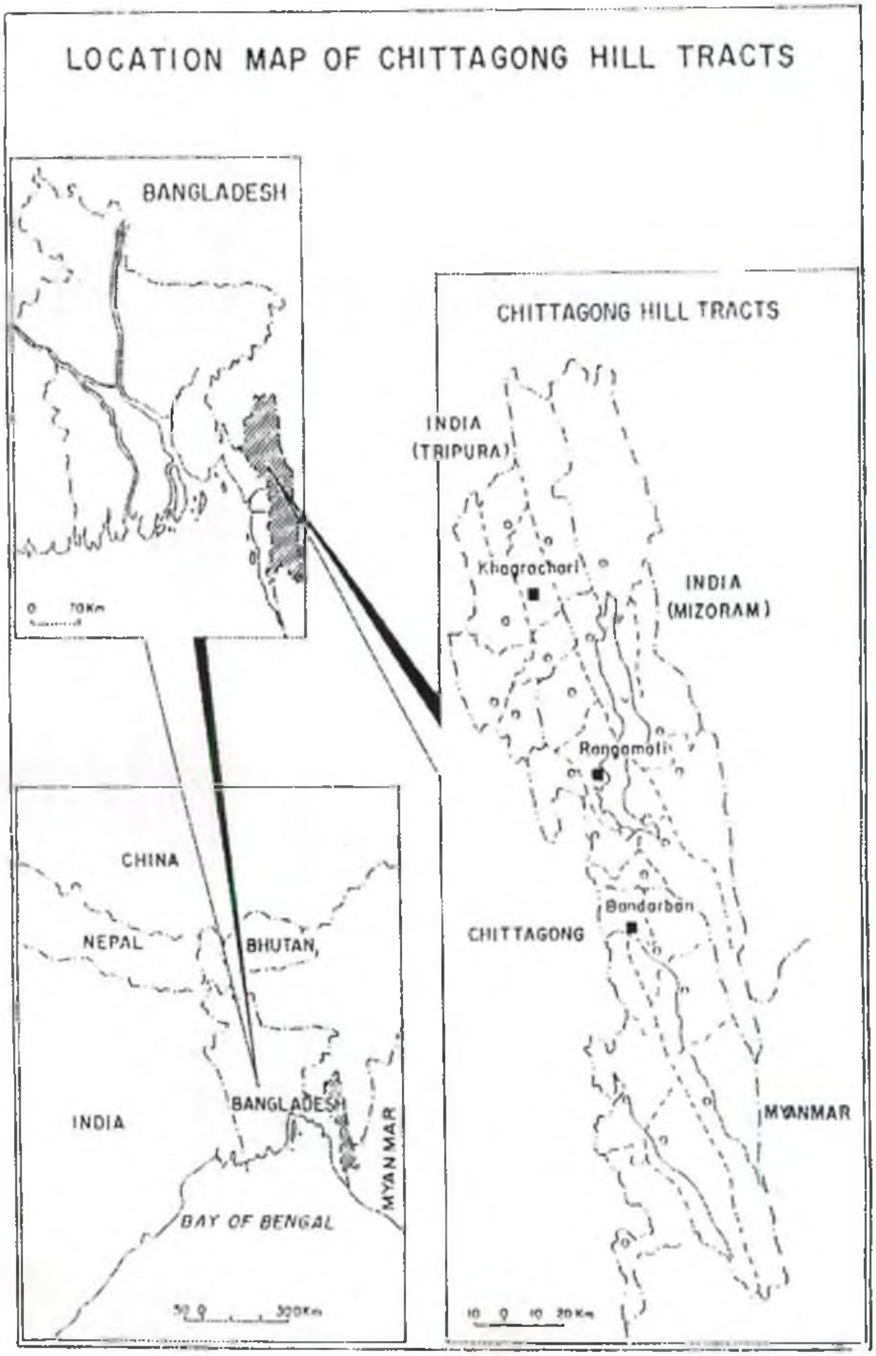

LOCATION MAP OF CHITTAGONG HILL TRACTS

মানচিত্র-২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে একটি নতুন প্রবাহ তৈরী হয়েছে। প্রায় ২ যুগ ধরে হানাহানি ও সংঘাতের এই পার্বত্যাঞ্চল এবং দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা সংকুল অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির পর পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ভিন্নরূপ লাভ করেছে। দীর্ঘদিন থেকে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব স্বকীয় সাংস্কৃতিক ধারা বহন করে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু কালের আবর্তে রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্যবাসী তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অনেকদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল। বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর এ সমস্যা আরো জটিল এবং ব্যাপক হয়ে উঠে। দীর্ঘ সময়ের এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সকাল ১০:২৫ মিনিট ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশে সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে সুধীসমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পার্বত্যবাসীদের মধ্যেও এ নিয়ে ভিন্নতা দেখা দেয়। এ চুক্তির অনেকাংশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।[১] এ চুক্তির ফলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তনের ধরণ ও গভীরতা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির প্রভাব নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে আলোচ্য গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

১। এই এলাকাটি বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন যেমন ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, উৎপাদন পদ্ধতিগত পার্থক্যগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, এই পার্থক্যজনিত কারণে কেন তারা বাংলাদেশের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি তা অনুসন্ধান করা এবং বিষয়টির বিভিন্ন মাত্রা এবং গভীরতা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

২। বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠীর সাথে উপজাতীয়দের পার্থক্য এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে সৃষ্ট সংকট উপজাতীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং এই অসন্তোষ থেকে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সেখানে সামরিক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের এই সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকটা বিভিন্ন হয়ে পড়ছিলো। এই পরিপ্রেক্ষিতেও এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা অপরিহার্য হয়ে উঠে।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট নিরসনের লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিপন্ন সময়ে যে সব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তার সাফল্য ও বিফলতা, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করাও গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪। বাংলাদেশের রাজনীতির যে বিশেষ পরিস্থিতিতে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের অগ্রগতি ঘটে এবং এই চুক্তি সম্পাদিত হয় তার রাজনৈতিক তাৎপর্য নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৫। শান্তিচুক্তি সম্পাদনে জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে দর কষাকষি এবং তারভিত্তিতে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্বক এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ভিত্তিক মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠে।

৬। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি কি গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা এবং এই চুক্তি বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।[২]

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধকে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য ও প্রতিবেদন এই গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিভিন্ন ম্যানুয়াল ও সরকারী গেজেট হতেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙ্গালীদের বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন ছাত্র, নারী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের পুস্তিকা ও প্রচারপত্রকে ও তথ্যের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। প্রশ্নপত্র পূরনের মাধ্যমে নমুনা জরিপ করে মাঠ পর্যায় হতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী ও বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ ঐ এলাকায় কর্মরত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং পাহাড়ী ও বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা গ্রহণ ও তথ্য নেয়া হয়েছে।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উপর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে বিদ্যোৎজনদের বক্তব্য ও মতামতকে গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতিগত বিবরণ:-

অবস্থান

২১.২৫ হতে ২৩.৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৫৪ হতে ৯২.৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের বিস্তৃত পর্বতমালা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত।

আয়তন

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এই তিনটি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বা Chittagong Hill Tracts এর মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,১৮৪ বর্গ কি.মি. যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় এক দশমাংশ।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল হলেও ১৮৬০ সনে চট্টগ্রাম হতে পৃথক করে জেলার মর্যাদা প্রদানকালে এর আয়তন ছিল ৬,৭৯৭ বর্গমাইল। ১৯০১ সনে এর আয়তন হ্রাস পেয়ে ৫,১৩৮ বর্গমাইলে দাঁড়ায়। সর্বশেষ ১৯৪৭ সনে ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেয়। অর্থাৎ ৮৭ (১৮৬০-১৯৪৭) বছরে ১,৭০৩ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।[৩]

সীমানা

ভৌগোলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ভারতে মিজোরাম রাজ্য এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল উপকূলীয় জেলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৩৬.৮০ কিলোমিটার মিজোরাম রাজ্যের সাথে ১৭৫.৬৮ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের চীন ও আরাকান প্রদেশের সাথে ২৮৮.০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।[৪]

ভূ-প্রকৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপ মূলতঃ ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশে বিস্তৃত সুবিশাল আরাকান ইয়োমা পর্বতমালার একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এলাকাটি ফেনী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী এবং এদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপনদী, শাখা নদীর উপত্যকার চারভাগে বিভক্ত হয়েছে। এসব উপত্যকাগুলো হচ্ছে চেঙ্গী উপত্যকা। কাসালং উপত্যকা, রাইনমিয়াং উপত্যকা এবং সাঙ্গু উপত্যকা, পর্বতগুলো এসকল উপত্যকা সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এবং উচ্চতা কয়েকশ ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিংডং - এর উচ্চতা ৩,১৮৫ ফুট যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

পার্বত্য অঞ্চলের নদ-নদীগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো অত্যন্ত খরস্রোতা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী। ১৯৬০ সালের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীতে বাঁধ দেয়া শেষ হয়। এর ফলে কর্ণফুলী উপত্যকাটি একটি প্রশান্ত কৃত্রিম হ্রদে পরিণত হয় যার আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৩০০ বর্গমাইলে।[৫]

জলবায়ু

জলবায়ুগত বিভাজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জমন্ডলীয় উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সে. মি.। গ্রীস্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩০ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং শীতাকলীন গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, গ্রীস্মকালে ৪০/৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং শীতকালে সর্বনিম্ন ৪/৫ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানামা করে।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভিদ ও প্রাণি

পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেকেরও বেশী ভূমি পাহাড়ী বনাচ্ছাদিত। বনভূমি একাধারে চিরসবুজ পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ঘণ ঝোপঝাঁড়ের সমন্বয়ে গঠিত। বনভূমিতে সেগুন, তৃণ, তেলসূর, গর্জন, গামার, চাপালিস, কড়ই ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে।[৬] বনভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৭,০৪৬ বর্গ কিলোমিটার। বনভূমিতে রয়েছে হাতী, বানর, বনগরু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী এবং নানা প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য পাখ-পাখালি।

প্রশাসনিক পটভূমি

১৮৬০ সালে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব অংশে অবস্থিত পার্বত্য এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা।

১৯০০ সালে The Chittagong Hill Tracts Regulation নামক এক আইন জারির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই রেগুলেশন রুলস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি প্রবিধি আদেশ ইত্যাদিকে Hill Tracts Manual বলা হয়। Hill Tracts Manual মোতাবেকই পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসিত হতো। এই Manual মোতাবেক সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভিন্ন এলাকা ও ভিন্ন উপজাতীয়গণের আবাসের ভিত্তিতে ৩টি সার্কেলে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো চাকমা সার্কেল সদর দপ্তর (রাঙ্গামাটি), বোমাং সার্কেল সদর দপ্তর (বান্দরবান) এবং মং সার্কেল সদর দপ্তর (মানিকছড়ি)।

সার্কেলের প্রধানকে চীফ বা সাধারণ মানুষের ভাষায় রাজা বলা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত জেলা ও মহকুমা প্রশাসকগণ প্রশাসন পরিচালনা করলেও সার্কেল চীফগণের একটা ভূমিকা বরাবরই ছিলো। যেহেতু বৃটিশ আমলে বঙ্গ প্রদেশ -এর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে থেকেও একটা ভিন্নতর আইন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসিত হতো সেহেতু এটাকে Non Regulated জেলা বলা হতো। ১৯৪৭ সালের পরেও মোটামুটিভাবে Hill Tracts Manual কে মান্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত পাকিস্তানের সংবিধানে এ পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area এর মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৬২ এর সংবিধানে এ মর্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

বদলিয়ে Tribal Area বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে Hill Tracts Manual-এ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। ১৯৮৩ সালে এ অঞ্চলটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এই ৩টি জেলায় বিভক্ত হয়। এই ৩টি পার্বত্য জেলার যে পৃথক পৃথক স্বায়ত্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়, সেই ৩ জেলা পরিষদকে "স্থানীয় সরকার পরিষদ" নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৭]

জেলা পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ যে তথ্য দেয়া যায় তার বিবরণ :

১। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা :

আয়তন : ৬,১১,৬১৩ বর্গ কিলোমিটার

জনসংখ্যা : উপজাতীয় ২,২৩,২৯২জন এবং বাঙ্গালী ১,৭৮,০৯৬ জনসহ মোট জনসংখ্যা : ৪,০১,৩৮৮ জন।

শিক্ষার হার : ৩৬.৪৮% কলেজ ৩ টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৩৯টি, জুনিয়র বিদ্যালয় ১২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫০৭টি, কারিগরি বিদ্যালয় ৩ টি।

জেলার বসবাসকারী উপজাতিগুলির নাম :

(১) চাকমা (২) মারমা (৩) ত্রিপুরা (৪) তন চংগ্যা (৫) লুসাই (৬) পাংখো
(৭) যিয়াং (৮) মুরং (৯) চাক (১০) লুসি (১১) বোম।

জেলার ভৌগোলিক অবস্থান :

বর্তমান ৩টি পার্বত্য জেলার মধ্যভাগে এই জেলা অবস্থিত। আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে এটা তিনটি জেলার মধ্যে সর্ববৃহৎ। রাঙ্গামাটির উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলা, দক্ষিণে বান্দরবান জেলা, পূর্বে ভারতের মিজোরাম এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা।[৮]

বনভূমির পরিমাণ:

(ক) সংরক্ষিত বনভূমি - ২,৩১৮ বর্গ কিলোমিটার

Dhaka University Institutional Repository

(খ) অশ্রেণীভূক্ত বনভূমি - ২,২৭১ বর্গ কিলোমিটার

থানার সংখ্যা ও নাম :

(১) রাঙ্গামাটি সদর (২) কাউখালী (৩) নানিয়ার চর (৪) লংগদু (৫) বাঘাইছড়ি (৬) বরকল (৭) জুরাছড়ি (৮) রাজস্থলী (৯) বিলাইছড়ি এবং (১০) কাপ্তাই।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৪৬

মৌজা সংখ্যা : ১৬৪

স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা

(১) চাকমা	:	১০	জন
(২) মারমা	:	৪	,,
(৩) তনচংগ্যা	:	২	,,
(৪) ত্রিপুরা	:	১	,,
(৫) লুসাই	:	১	,,
(৬) পাংখো	:	১	,,
(৭) খিয়াং	:	১	,,
(৮) বাঙ্গালী	:	১০	,,
মোট	:	৩০	,,

জেলার বৈশিষ্ট্য : ১৯৫৮-৫৯ সালে কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণের ফলে যে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়, তার আয়তন ৮৯৭ বর্গ কিলোমিটার, যার অধিকাংশ এলাকা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মধ্যে অবস্থিত।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

(ক) আয়তন : ২,৬৬০ বর্গ কিলোমিটার

(খ) জনসংখ্যা : উপজাতীয় ২,০৪৬৩৫ জন। বাঙ্গালী ১,২৫,৬৪০ জনসহ মোট জনসংখ্যা ৩,২৯,৯২৩ জন।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) শিক্ষার হার : ২০% কলেজ ৫টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৫৬টি, কারিগরি বিদ্যালয় ১টি।

বসবাসকারী প্রধান উপজাতি : ৩টি

(ক) চাকমা (খ) মারমা (গ) ত্রিপুরা।

থানার সংখ্যা ও নাম : ৮

(ক) খাগড়াছড়ি সদর (খ) দীঘিনালা (গ) পানছড়ি (ঘ) মহালছড়ি (ঙ) মাটিরাঙ্গা (চ) মানিকছড়ি (ছ) রামগড় এবং (জ) লক্ষীছড়ি।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ৩৫

মৌজার সংখ্যা - ১১৮

বনভূমির পরিমাণ

(ক) সংরক্ষিত বনভূমি - ১০৩ বর্গ কিলোমিটার

(খ) অশ্রেণীভূক্ত বনভূমি : ১,০৯৪ বর্গ কিলোমিটার

জেলার ভৌগোলিক অবস্থান :

তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার এবং বর্তমান তিন পার্বত্য জেলার সর্বোত্তরে অবস্থিত। খাগড়াছড়ি জেলার উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলা, পূর্বে মিজোরাম এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম জেলা।

স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন

(১) চাকমা : ৯ জন

(২) ত্রিপুরা : ৬ ,,

(৩) মারমা : ৬ ,,

(৪) বাঙ্গালী : ৯ ,,

মোট : ৩০ জন

Dhaka University Institutional Repository

বান্দরবান পার্বত্য জেলা

(ক) আয়তন : ৪,৫০২ বর্গ কিলোমিটার

(খ) লোকসংখ্যা : উপজাতীয় ১,১০,৩৩৩ জন এবং বাঙ্গালী ১,২০,২৩৬ জন সহ মোট জনসংখ্যা ২,৩০,৫৬৯ জন।

(গ) শিক্ষার হার : ২৩.৮৮% কলেজ ২টি, উচ্চ বিদ্যালয় ১৫টি, জুনিয়র বিদ্যালয় ২৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩১০টি।

বসবাসকারী উপজাতীর সংখ্যা ১২টি

মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, তনচংগ্যা, বোম, চাকমা, খুশী, খিয়াং, চাক, উসাই, লুসাই, পাংখো।

থানার সংখ্যা ও নাম : ৭

(১) বান্দরবান সদর (২) রুমা (৩) রোয়াংছড়ি (৪) থানচি (৫) নাইক্ষ্যংছড়ি (৬) আলীকদম এবং (৭) লামা।

ইউনিয়নের সংখ্যা : ২৮

মৌজা সংখ্যা : ৯৬

বনভূমির পরিমাণ : (ক) সংরক্ষিত বনভূমি : ৭৫১ বর্গকিলোমিটার
(খ) অশ্রেণীভূক্ত বনভূমি : ২,১২৫ বর্গ কিলোমিটার

জেলার ভৌগোলিক অবস্থান :

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পার্বত্য অঞ্চলের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তনের দিক দিয়ে এই জেলার স্থান তিন জেলার মধ্যে দ্বিতীয়। লোকসংখ্যার দিক দিয়ে এর স্থান তৃতীয়। এর উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলা, দক্ষিণে বার্মা, পূর্বে বার্মা এবং পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য সংখ্যা : ৩০ জন।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা :

(১) মারমা ও খিয়াং	:	১০ জন
(২) মুরং	:	৩ ,,
(৩) ত্রিপুরা	:	১ ,,
(৪) তনচংগ্যা	:	১ ,,
(৫) বোম, পাংখো, লুসাই	:	১ ,,
(৬) চাকমা	:	১ ,,
(৭) খুমী	:	১ ,,
(৮) চাক	:	১ ,,
(৯) বাঙ্গালী	:	১১ ,,
মোট	:	৩০ জন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমির বিবরণ

২.১ সামাজিক - সাংস্কৃতিক পটভূমি

১৩টি মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। যেমন : চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তনচৈংগা, বোম, পাংখো, খুমী, স্নো, যিয়াং, চাক, লুসাই, রিয়াং। এর মধ্যে ৭টি প্রধান উপজাতির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(১) চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় চাকমারা বসবাস করে।

ধর্ম : চাকমারা বৌদ্ধ। এদের ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক।

ভাষা : চাকমারা বাংলা ও আরাকানী ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাষাকে চাকমা বাংলা ভাষা বলা যেতে পারে। তবে তাদের মূল ভাষা বাংলা।

(২) মারমা : রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলায় বসবাস করে।

ধর্ম : মগ বা মারমা বৌদ্ধ, তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'যাদুচুয়াং'।

ভাষা : মারমাদের উপভাষা মগী। মগী আরাকানী ভাষার একটি রূপ।

(৩) ত্রিপুরা : এ উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র এলাকায় বসবাস করে।

ধর্ম : এরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

ভাষা : এদের নিজস্ব ভাষা আছে। এদের ভাষাকে 'হাল্লামী' ভাষা বলে। তবে কোন বর্ণমালা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) মুরং : এরা রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এলাকায় বসবাস করে।
ধর্ম : এরা বৌদ্ধ। তবে কিছু কিছু মুরং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।
ভাষা : মুরংদের নিজস্ব ভাষা আছে। তবে কোন বর্ণমালা নেই।

(৫) তনচৈংগা : বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলায় বসবাস করে।
ধর্ম : এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
ভাষা : তনচৈংগারা চাকমাদের একটি অংশ। তাই চাকমা ভাষার সাথে তাদের ভাষার অনেক মিল আছে।

(৬) চাক, পাংখো : বান্দরবান জেলায় এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।
ধর্ম : এদের ধর্ম বৌদ্ধ।
ভাষা : এদের নিজস্ব ভাষা আছে। তবে কোন বর্ণমালা নেই।

(৭) লুসাই, খুমী : এদের বসবাস রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান জেলায়।
ধর্ম : খুমীদের ধর্ম বৌদ্ধ এবং লুসাইদের ধর্ম প্রেতপূজা।
ভাষা : লুসাইদের ভাষাকে লুসাই বা দোলনে ভাষা বলে। তবে কোন বর্ণমালা নেই। খুমীরা অন্যের ভাষা শিখে না। অপরকে নিজেদের ভাষা শিখতে দেয়না।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে এক কথায় পাহাড়িয়া বলে অভিহিত করা হয়। এই পাহাড়িয়াদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।[১০] সোফার এদেরকে 'টিলাবাসী পাহাড়িয়া' ও 'তীরবাসী পাহাড়িয়া' এবং হাটার তাদেরকে যথাক্রমে 'পাহাড়ী উপজাতী' এবং 'উপত্যকাবাসী উপজাতি' হিসাবে বিভক্ত করেছেন। পাহাড়ী উপজাতীর অন্তর্ভূক্ত গোষ্ঠীগুলো হলো যথাক্রমে লুসাই, পাংখো, বোম, ম্রো, খুমী এবং উপত্যকাবাসী উপজাতীয়রা হলো চাকমা, তনচৈংগা, রিয়াং, খিয়াং, চাক ও মুরং গোষ্ঠীভুক্ত।

বসত এলাকাকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দেরকে ২ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির বৈসাদৃশ্যের বিবেচনায় প্রত্যেকটি উপজাতিই আবার স্বতন্ত্র্য অস্তিত্বের অধিকারী।[১১] পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি উপজাতি তাদের নিজস্ব

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় (Dialect) কথা বলে। সোফারের মতে, অধিকাংশ উপজাতীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে যা তিব্বতীয় বর্মী ভাষার শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ভাষার লিখিত রূপ নেই। তবে বর্মী ভাষার অনুকরণে চাকমাদের লিখিত ভাষার লুপ্ত প্রায় অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ট্রাইগ্রাল একাডেমীর গবেষকগণ ব্যতীত শিক্ষিত চাকমারাও এই ভাষার লিখিত রূপ সম্পর্কে জ্ঞাত নন।
ভাষাগত বৈসাদৃশ্য ছাড়াও উপজাতীয়দের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রয়েছে। চাকমা, মারমা, চাক, খিয়াং ও তনচৈংগা প্রভৃতি উপজাতিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা ও রিয়াং হিন্দু ধর্মাবলম্বী, লুসাই, পাংখো ও বনযোগী উপজাতিরা খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য উপজাতীর জনগোষ্ঠী সর্বপ্রাণবাদী বা Animist.[১২]

ভাষা ও ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক ও জীবন প্রণালীর ক্ষেত্রে অভিন্নতার সূত্র লক্ষ্য করা যায়। [১২]গোষ্ঠী নির্বিশেষে তাদের মধ্যে যেসব সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো :

(১) তারা সকলেই মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) পাহাড় ও অরণ্যে বসবাসে অভ্যস্ত এবং

(৩) অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক অথবা উত্তরাধিকারী।

২.২ পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক পটভূমি

এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বংশানুক্রমিক পেশা ও অর্থনীতির ভিত্তি ছিলো জুম কৃষি। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারনা, আনুমানিক খৃষ্ঠ জন্মের ৩০০০ থেকে ১৩০০ পূর্বাব্দ সময়সীমার ভেতরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই কৃষির বিকাশ ঘটতে শুরু করে।[১৪] এতে কোন ভূমি বা ভূমিখন্ডকে স্থায়ী চাষাবাদের আওতায় রাখা হয় না। সাধারণ ভাষায় এর নাম Shifting Cultivation অথবা Slash and burn agriculture (কেটে পোড়ানো কৃষি) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাই হলো বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল, যেখানে 'জুম চাষ' নামের এই সুপ্রাচীন কৃষি পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে।

এক সরকারী হিসাব থেকে জানা যায় যে, এক সময় ১,০২,৪৬৮ একর বা পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের ৪.৩ শতাংশ এলাকায় জুম চাষ করা হতো। জুম চাষের উপযোগী পাহাড়ী জমির দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৮ হাজার একর জমিতে ফসল উৎপাদন করা হয়। প্রতি বছর ২৬ হাজার পরিবার ১২০ বর্গমাইল এলাকায় জুম চাষ করত।[১৫]

জুম চাষ এখন আর আগের মতো মোটেই লাভজনক নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে জুম চাষ বা পালাক্রম চাষই ছিলো একমাত্র কৃষি ব্যবস্থা। ঐ সময় পার্বত্যবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই পালাক্রম কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলো।

পরবর্তীকালে সেখানে ধীরে ধীরে পালাক্রম চাষের পাশাপাশি হাল কৃষি বা লাঙ্গল কৃষি প্রবর্তিত হতে থাকে।[১৬] বর্তমানে জুম চাষ বা পালাক্রম চাষের সাথে সংযুক্ত উপজাতীয়দের পূর্বেকার অবস্থান অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। হাল কৃষির পর্যায়ক্রমিক প্রসার এবং পার্বত্য ভূমির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে রাবার চাষ, ফল চাষ, ও কাঠের গাছ চাষে সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পালাক্রম চাষের উপর নির্ভরতার মাত্রা অনেকটা কমে গেছে।[১৭]

পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের চাষ ব্যবস্থার আলোকে উপজাতীয় জনগণকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

১। পালাক্রম চাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী।

২। প্রধানতঃ পালাক্রম চাষের উপর নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী।

৩। প্রধানতঃ হাল কৃষি এবং উদ্যান চাষের উপর নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী।

৪। হাল কৃষি ও উদ্যান চাষের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পাবত্যবাসী।

সোফার এবং হাটার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে 'পাহাড়ী উপজাতি' এবং 'উপত্যকাবাসী উপজাতি' হিসাবে বিভক্ত করেছেন। যে সব উপজাতি ১পার্বত্যবাসী' তারা জুম চাষী।[১৮] যারা জুম চাষের সাথে যুক্ত তাদের অর্থনীতি ভোগভিত্তিক (Subsistance Level Economy) এদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে না। এদের জীবন-যাপন প্রণালী আড়ম্বরহীন।

Dhaka University Institutional Repository

উপত্যকাবাসীর উপজাতীয়রা হাল কৃষি বা লাঙ্গল চাষের সাথে প্রধানতঃ যুক্ত ছিল। এরা উদ্বৃত্ত ফসল (বিশেষভাবে ধান, যব, ভুট্টা) উৎপাদনে সমান হওয়ায় উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ বাজারে বিক্রী করে নগদ অর্থ লাভ করতো। এরা উদ্যান তৈরী, কাঠের চাষ মৎস্য খামার, রাবার বাগান ও ফলমূলের চাষের সাথে জড়িত থেকেও নগদ অর্থ উপার্জন করেছে।[১৯] এরা-

১. ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। এর ফলে (ক) ঠিকাদারী (খ) কুটির শিল্প (গ) পণ্য বাজারজাতকরণ।

২. এদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করতে পাঠায়। এর ফলে

(ক) দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ পায়।

(খ) সরকারী বেসরকারী চাকরী পায়।

(গ) নিজেরাই স্ব-উদ্যানে আধুনিক সেক্টরে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়।

অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং পেশাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে উপত্যকাবাসী উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক জীবন প্রণালীতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে তারা সনাতন জীবন ধারা হতে আধুনিক জীবনধারার দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু যেসব উপজাতি প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থার সাথেই আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে রয়েছে, তাদের জীবন প্রণালী সনাতন অবস্থায়ই রয়ে গেছে এবং তারা আধুনিক জীবন উপকরণ থেকে বঞ্চিত।[২০]

২.৩ ভূমির প্যাটার্ণ এবং মালিকানার ধরন

বাংলাদেশের আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৬৪-৬৬ সালে কানাডা ইন্টারন্যাশাল কোম্পানী কৃষি সংস্থার পক্ষে এ জেলার মৃত্তিকা ও ভূমি জরিপ চালায় এবং নিম্নবর্ণিত ফলাফল উল্লেখ করেন।[২১]

১। 'এ' শ্রেণী : এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ১,০৪,৩০৪,৬৪ একর যা কৃষি ও সব কাজের উপযোগী।

২। 'বি' শ্রেণী : এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ৯৪,৫২৬,৬৪ একর। এ জমির কিছু অংশ সমতল করে নিয়ে চাষ করা যায়। বাকী জমি কেবল ফল ও সবজি চাষের উপযোগী।

Dhaka University Institutional Repository

৩। 'সি' শ্রেণী : এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ৫,০৫,২২,৫৬০ একর। এর বহুলাংশ ফল, সবজি ও কিছু অংশ বনায়নের উপযোগী।

৪। সি ও ডি শ্রেণী : এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ৪৫,৬৬,৩২৮ একর যা বনায়নের জন্য উপযোগী। কিন্তু সমতল করার পর ফল ও সবজি চাষের উপযোগী।

৫। 'ডি' শ্রেণী : এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ২৫,০৯,৮৩,০৪০ একর যা কেবলমাত্র বনায়নের জন্য উপযোগী।[২২]

এখানে ভূমি জরিপ (Settlement Record) হয়নি, ব্যক্তিগত মালিকানা অস্পষ্ট। মোগল শাসনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকার ছিল প্রথা ও রীতিনীতির উপর। বৃটিশ সরকার মূলত : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিদ্যমান প্রথা ও রীতি-নীতিসমূহে হস্তক্ষেপ না করেই ভূমির মালিকানা নিয়ে উপনিবেশিক শাসন কায়েম করে।[২৩] ১৯০০ সালের রেগুলেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে পাহাড়ীদের কিছু অধিকার স্বীকৃত হলেও ভূমি প্রশাসন সম্পূর্ণ বৃটিশদের হাতে ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে পার্বত্য রাজাগণ শুধুমাত্র নরপতি। ভূ-পতি নয়। ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে রেগুলেশনের ৩৪, ৪৯, ৫১ ও ৫২ বিধি উল্লেখযোগ্য।

৩৪ বিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অপাহাড়ীদের জন্য জমি ক্রয় বা বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৫১ বিধি অনুসারে ডেপুটি কমিশনার পার্বত্যবাসীদের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার কারণে বহিরাগতকে এ অঞ্চল থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিষ্কার করতে পারতেন। আর ৫২ বিধি অনুসারে ডেপুটি কমিশনার কেবলমাত্র স্থানীয় হেডম্যান ও গোত্রপতির সুপারিশে অপাহাড়ীদের বসতি স্থাপনের জন্য অনুমোদন করেন। আর মৌজা হেডম্যান ডেপুটি কমিশনারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব আদায় করেন।[২৪]

বৃটিশ সরকার খাজনা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পার্বত্যবাসীকে হাল চাষে উৎসাহিত করার জন্য জমি বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। [২৫]বন্দোবস্ত গ্রহীতা জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার পর চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করতো, আর উত্তরাধিকারীরা ভোগ করত। এভাবে বন্দোবস্ত গ্রহীতা ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ছাড়া উক্ত জমি হস্তান্তর করতে পারতেন না। তবে ঐ জমির উপর তৈরী করা ঘর-বাড়ী বা রোপিত গাছ বা উৎপাদিত ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

বিভিন্ন উপজাতি যখন রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে না এবং সরকার তাদের স্বার্থকে যথাযথ পূরণ করে না, তখনই উপজতি সমস্যার সৃষ্টি হয়।[২৬] বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যাও শুরু হয়েছে এভাবেই। উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারকে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেও বাঞ্ছিত ফল লাভ করেনি। ফলে কালক্রমে সৃষ্টি হয়েছে আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের মত জটিল পরিস্থিতি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য এ বিষয়কে ২ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো। ১ম অংশে সমস্যাটির সঠিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা হলো। এ অংশের শুরুতে প্রয়োজনীয় নৃ-তাত্ত্বিক তথ্যও সংযোজিত হয়েছে। ২য় অংশে সমস্যা সমাধানে এ যাবৎ গৃহীত সরকারী নীতি ও পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন করা হলো।[২৭]

২.৫ বিভিন্ন সরকারের নীতি নির্ধারণের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, সুদূর অতীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল এবং অঞ্চলটি বহুবার হাত বদল হয়। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় ৫৯০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জুযা রুপা (বীর রাজা) আরাকান রাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচলিত বর্ণনানুসারে, ত্রিপুরার রাজা উদয়গিরি কিলাই এবং মংলাই নামে দুই ভাইকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন এবং তারা মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণে পাহাড়ে বসবাস করতে থাকে।[২৮] ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজা সুলা সান্দ্র চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার দখল করে নেন। ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা পুনরায় এটিকে উদ্ধার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ সুলতানী আমল

সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯) চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ বিজয় করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে ১৪১৮ সালে চাকমা রাজা মোরান শ্রী বার্মা হতে বিতাড়িত হয়ে আলী কদমে একজন মুসলিম রাজকর্মচারীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি (রাজকর্মচারী) রামু এবং টেকনাফে চাকমাদের বসতি স্থাপনে অনুমতি দেন।[২৯] ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুয়া মংঝি আরাকানের সিংহাসন দখল করে রাজা মং সোমওয়ানকে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত রাজা গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৮-৩১) নিকট প্রতিকার চাইলে সুলতান ১৪০০ সালে ওয়ালী খান নামক চট্টগ্রামে নিযুক্ত এক সেনাপতিকে নির্দেশ দেন মগ রাজা মং সোমওয়ানকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু রাজা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে ওয়ালী খানকে হত্যা করেন এবং আরাকান দখল করে বিতাড়িত রাজা মং সোমওয়ানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

মং সোমওয়ানের উত্তরসূরী মং যা রী (১৪৩৪-৩৯) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে দিল্লির সুলতানদের নিকট হারানো ভূমি উদ্ধার করার চেষ্টা চালান এবং রামু ও টেকনাফ হতে চাকমাদের বিতারিত করেন।[৩০] সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৪৫৯-৭৪) তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সমর্থ হন। কিন্তু সম্রাট আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বকালে আরাকান রাজা স্বল্প সময়ের জন্য এ অঞ্চল দখল করেন। সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় আরাকান সম্রাট নুসরাত খানের নেতৃত্বে।

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং আরাকানের কিছু অংশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ১৫১৮ সালে আরাকানের মন রাজা মিনইয়াজা কিছু ভূমি জয় করেন। এভাবে চলতে থাকে দখল পাল্টা দখলের খেলা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আরাকান রাজা মং কালাউন ওরফে সিকদার শাহ (১৫৭১-১৫৯৩) ইং বিজয়ী হন এবং সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল নোয়াখালীর বেশীরভাগ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ জয় করেন। ১৬০১ সালে রাজা মং রাজগ্নী তার বর্মী এবং মুসলিম উপাধি সহকারে আরবী বার্মা এবং দেবনগিরী এই তিন ভাষার মুদ্রা চালু করেন।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ শের শাহ ও মোঘল আমল

চট্টগ্রাম শহরের সম্রাট শেরশাহের আমলে পর্তুগীজ নাবিকরা চট্টগ্রাম শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে দিয়াংগা এবং আরাকান উপকূল সিরিয়ামে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এ সকল পর্তুগীজ কিরিঙ্গিরা আরাকান কর্তৃপক্ষের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করে প্রায়ই দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়।[৩২] এ সকল পর্তুগীজ জলদস্যুরা চট্টগ্রামের স্থানীয় জনগণ যারা সাধারণভাবে মগ নামে পরিচিত তাদের সহযোগিতায় সমতল এলাকার দস্যুবৃত্তি পরিচালনা করতো। এ সকল দস্যুর অত্যাচারে সমতল অঞ্চলের জনগণের শান্তি ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং মোঘল প্রশাসন এদেরকে শায়েস্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বাংলার তৎকালীন সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগীজ উপনিবেশকারী এবং আরাকান রাজ্যের মধ্যকার কলহের সুযোগে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিজয় করেন এবং ধার্মিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশানুসারে এ অঞ্চলের নাম দেন ইসলামাবাদ। পরবর্তীতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল অধিকারে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বিরাজ করে।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল

১৭৬০ সালে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত চট্টগ্রাম জেলার সাথে সাথে এর পার্বত্য অংশের ভাগ্যও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সমর্পিত হয়।[৩৪] কিন্তু ইংরেজরা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পুরো প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ফলে, এ অঞ্চলকে তারা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত জেলা হিসাবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় এবং যেখানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে উপজাতীয় হেড ম্যানদের হাতে, আর ইংরেজ প্রতিনিধিগণ শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকা থেকে কর আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রতিটি গোত্র প্রধান চট্টগ্রামের কালেক্টরকে বার্ষিক সেলামী প্রদান করার বিনিময়ে সমতলের লোকদের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা পায়।

১৮৮৭ সালের ২৪ জুন তারিখে ইষ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী চট্টগ্রাম প্রতিনিধির কাছে লিখিত আরাকান রাজার পত্র হতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।[৩৫] রাজা তার পত্রে আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসা কিছু গোত্রের নামোল্লেখ করেন যারা পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে উভয় দেশে লুটপাট চালাচ্ছিল। রাজার পত্রে উল্লেখিত গোত্রগুলো হচ্ছে মগ, মুরং, পাংখো, এবং বনযোগী, যারা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে। আরাকান রাজা উভয় দেশের বন্ধুত্ব স্থিতিশীল রাখা এবং ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদের ব্যবহৃত রাস্তাগুলো নিরাপদ রাখার স্বার্থে এ সকল দস্যুদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বিতাড়নের জন্য চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী উপজাতীয়রা পূর্বদিককার স্বাধীন গোত্রসমূহের দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হওয়ায় কাপ্তাই খালের পাড়ে অবস্থিত একটি ইংরেজ দূর্গ আক্রান্ত হওয়ায় ১৮৫৯ সালে চট্টগ্রামের কমিশনার পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রিত জেলার পরিবর্তে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট এর অধীনে আনার সুপারিশ করেন। তার এই সুপারিশ এ্যাক্ট ২২-এ গৃহীত হয় এবং ১৮৬০ সালে ১লা আগস্ট কার্যকর করা হয়।[৩৬] পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রিত জেলা হতে পরিবর্তন করে একজন Superintendent of Hill Tracts উপাধি দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করা হয় এবং অধীন গোত্রসমূহকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এর অধীনস্ত এলাকাকে এ সময় Hill Tracts of Chittagong তথা চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ঐ সময় থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ ভারতের বাংলা বা বেঙ্গল নামক

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশের একটি জেলা হয়। বিগত বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শুরুতে দেশব্যাপী প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তিনটি মহকুমা তিনটি স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত হয়। জেলাগুলোর বর্তমান নাম রাঙ্গামাটি হিল ডিস্টিক্ট বা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বান্দরবান হিল ডিস্ট্রিক্ট বা বান্দরবান পার্বত্য জেলা এবং খাগড়াছড়ি হিল ডিস্ট্রিক্ট বা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।[৩৭]

২.৯ বৃটিশ আমল

১৮৬০ সালে নতুন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক বছর পরে ১৮৬৬ সালে ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লেউইন নামক একজন ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক নিযুক্ত হন। তখন থেকেই উপজাতীয় সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৩৮] ১৮৭৪ সালে রাজা হরিশ চন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯২ সালে চাকমা সার্কেল ৯টি তালুকে বিভক্ত হয়। ধীরে ধীরে ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত সৃষ্টি হয় ৩২৭টি মৌজা, বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন চালানোর সুবিধার্থে মাঝে মধ্যে রাজাদের পরামর্শ চাইতো। রাজাদের পরামর্শের যথেষ্ট মর্যাদাও দেয়া হতো। রাজাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ও জেলখানা ছিল। উপজাতিদের গুরুতর অপরাধ যেমন: ধর্ষণ, খুন, ডাকাতি ছাড়া লঘু অপরাধের সাজা রাজারা নির্ধারণ করতেন। গুরুতর অপরাধের সাজা রাজারা সুপারিশ করে অপরাধীকে জেলা সুপারিনটেনডেন্টের আদালতে পাঠাতেন। জেলা সুপার সাধারণত: রাজাদের সুপারিশের সম্মান রাখার চেষ্টা করতেন।[৩৯]

দুইশত বৎসর আগে থেকে পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষত: চাকমা উপজাতীয় প্রধান অঞ্চলে, গ্রাম প্রধানকে "কার্বারী" নামে অভিহিত করা হত। বৃটিশ শাসন আসার পর একাধিক গ্রাম মিলিয়ে বিভিন্ন আয়তনের মৌজার সৃষ্টি করা হয়। মৌজাগুলোকে মূলত: ভূমি প্রশাসন, ভূমি কর প্রশাসন এবং সামাজিক প্রশাসনের ভিত্তি হিসাবে গড়ে তোলা হয়। মৌজা প্রধানকে 'হেডম্যান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪০] শাব্দিক অর্থে হেডম্যান মানে যদিও উপরন্ত পুরুষ বা প্রধান পুরুষ; তার মানে এই নয় যে, কোন মহিলা মৌজা প্রধান নিযুক্ত হতে পারেননি বা হননি। অতীতের মত বর্তমানেও কয়েকজন মহিলা হেডম্যান আছেন।[৪১] হেডম্যানের সুপারিশে রাজা কার্বারী মনোনয়ন করেন এবং রাজার সুপারিশে সরকারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিযুক্ত করেন। তবে, জেলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসক রাজার সুপারিশ মানতে বাধ্য ছিলেন না। কোন একজন রাজা (উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমানের চাকমা সার্কেলের রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়) নিজেও এক বা একাধিক মৌজার হেডম্যান হতে পারেন। গ্রামে বা মৌজায় ছোটছোট অপরাধের বিচার ও সামাজিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করতেন যথাক্রমে কার্বারী ও হেডম্যান উপজাতি প্রথা অনুসারে বিচার বসতো। সাজা হতো উপজাতি কানুনে। রাজা প্রথা বংশানুক্রমিক হলেও কার্বারী ও হেডম্যান প্রথা বংশানক্রমিক নয়।

১৮৬৭ সালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরিবর্তন করে তা ডেপুটি কমিশনার পদবীতে উন্নীত করা হয় এবং তাকে পার্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব এবং বিচার সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা অর্পন করা হয়।[৪২] এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ৩টি মহকুমায় বিভক্ত করে ডেপুটি কমিশনারের অধীনস্ত কিছু কর্মচারীকে সেগুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আরো পদক্ষেপ হিসাবে ১৮৮১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত Police Regulation Act- এর অধীনে উপজাতীয় সদস্যদের নিয়ে পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন থানাতে তাদের নিয়োগ করা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য তারা ব্যবহৃত হয়েছিল।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

২.১০ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং এর কার্যকারিতা

বলা হয়ে থাকে ১৯০০ সালের CHTS Regulation Act, এর কতিপয় ধারা আসলেই প্রত্যক্ষভাবে পাহাড়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের রক্ষাকবচ স্বরূপ ছিল। এ রেগুলেশন অনুসারে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় অন্যান্য জেলার শাসন ব্যবস্থা থেকে এ ৩টি পার্বত্য জেলার শাসন ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। এ Regulation অনুসারে ডেপুটি কমিশনার একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভাগীয় বনকর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, দেওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা। পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দেওয়ানী (সহকারী জজ) ক্ষমতা ব্যতীত উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ডেপুটি কমিশনারের কার্যাবলী হতে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রবর্তিত হওয়ার ৯০ বছর পরও উপজাতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশেষত: রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা পার্বত্য অঞ্চলের বর্তমান সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে তা বলবৎ রাখার দাবী জানালে এই শাসন বিধির বিচার বিশ্লেষণ এখন একটি জরুরী প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৪৪]

Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 Act মূল আইন এবং উক্ত আইনের ক্ষমতা বলে প্রণীত বিধিমালাকে একত্রে সাধারণভাবে Hill Tracts Manual বলা হত এবং এ নামেই আইনটি সমধিক পরিচিত। এই Manual এর মোট পাঁচ অধ্যায়ে ২০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ১ম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় ৩-৪ অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যার মধ্যে কিছু কিছু আইন পরবর্তীতে বাতিল করা হয়েছে।[৪৫]

তৃতীয় অধ্যায়ের ৫-১০ নং অনুচ্ছেদে কর্মকর্তা নিয়োগ, তাদের বিচার সংক্রান্ত এবং অন্যান্য কিছু ক্ষমতার উল্লেখ রয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ের ১১-১৫ নং অনুচ্ছেদে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত লাইসেন্স বিষয়ে বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। ৫ম অধ্যায়ের ১৬-২০নং অনুচ্ছেদে পুলিশ প্রশাসন, মামলার আপীল নিস্পত্তি, বিধি প্রণয়ন, ক্ষমতা, উকিল নিয়োগে বিধি নিষেধ এবং দেশে তৎকালীন প্রচলিত কোন কোন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলায় রহিত করা হয়েছে। Hill Tracts Manual এর ১-১১নং বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার পদ্ধতি ১২-৩৩নং বিধিতে দলিলাদি রেজিস্ট্রেশন, ৩৪ নং বিধিতে জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর পদ্ধতি, জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ, ৩৫-

Dhaka University Institutional Repository

৪১নং বিধিতে সার্কেল, মৌজা বিভাগ, মৌজা হেডম্যান নিয়োগ পদ্ধতি, মৌজার ও উপজাতি প্রধানের বিচার ক্ষমতা, খাজনা আদায়, ৪২নং বিধিতে জুম কর, ৪৩নং বিধিতে জুমকর আদায়, ৪৫নং বিধিতে শন, গর্জন, খোলা ইত্যাদি কর আদায়, ৪৬নং বিধিতে হেডম্যানের ভাতা, ৪৭নং বিধিতে উপজাতীয় প্রধানদের খাস মৌজা রাখা, ৪৮ নং বিধিতে মৌজা হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্ত এবং ৫০-৫৪ নং বিধিতে কতিপয় বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন-বিধির ৩৪নং ধারায় অন্য জেলার লোককে জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, ৩৫নং বিধিতে ৩ উপজাতি প্রধানের ৩টি সার্কেল, সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং মাইনী ভেলী একটি বিভাগে ভাগ করা হয়। পরে অবশ্য ১৯২৬ সালের ১৭ই জুনের সংশোধনী বলে মাইনী ভেলী বিভাগ বাদ দেয়া হয়। ৩৮ নং বিধিতে ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য চাকমা সার্কেল, মং সার্কেল ও বোমাং সার্কেল -এর তিন প্রধানের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এই উপদেষ্টা পরিষদ নিজ নিজ সার্কেলের অধীন মৌজার হেডম্যানদের মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং এলাকায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা, জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। ৪০নং বিধিতে সার্কেল প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষতঃ নিজ নিজ সামাজিক প্রথা অনুসারে সামাজিক বিরোধসমূহ বিচার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। উক্ত বিধি বলে সার্কেল প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদেরকে কিছু কিছু ফৌজদারী অপরাধ বিচারের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে। ৫০ নং বিধিতে বন্দোবস্ত ছাড়া ৩০ শতাংশ জমি বাস্তুভিটা হিসাবে দখল করার অধিকার উপজাতীয়দের প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার ৫১ বিধি বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির অবস্থানকে যদি বিপদজনক মনে করেন তাহলে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এই জেলা থেকে বহিস্কার করতে পারেন।[৪৬]

এভাবে Chittagong Hill Tracts Manual পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন ভাষাভাষি উপাজাতীয়দের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সত্ত্বা বজায় রাখার ব্যাপারে এই ম্যানুয়েল সর্বদিক থেকে না হলেও অনেকাংশে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পেরেছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের শাসন-বিধি বলবৎ থাকার কারণে গ্রাম, ইউনিয়ন, জেলা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোন গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান কাজ করার সুযোগ লাভ করতে পারেনি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ব্যাপক জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বপ্রথম সফলভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে।

১৯০০ সালের ম্যানুয়েল পার্বত্য এলাকাকে একটি বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে এক ব্যক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করে। একটি বিশেষ এলাকার শাসক হিসেবে ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভালমন্দের দিকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিশেষ নজর দিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি তাঁর কোন কাজের জন্য স্থানীয় কোন প্রতিনিধি বা জনগণের কাছে দায়ী নন। তিনি তাঁর যে কোন কাজের জন্য সরাসরি জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী। অবশ্য পরে এই ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এবং পার্বত্য অঞ্চলে এক ব্যক্তির শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনির্ধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার নামে সীমিত স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[৪৭]

মোঘল শাসনামলে চাকমা রাজারা ছিলেন করদ রাজন্যবর্গ। চাকমা রাজারা রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাই মোঘল শাসনামলে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হলেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে কোন বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সুচতুর ইংরেজ শাসকরা তাদের আগেকার স্বাধীন সত্ত্বা বহাল রাখার নিমিত্তে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act, জারি করে পরিস্থিতি সামাল দেন। এতে ফুঁসে ওঠা অসন্তোষ ধীরে ধীরে থেমে যায়। অত:পর আর কোন বড় ধরণের বিদ্রোহ বা অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হয়নি চতুর ব্রিটিশ সরকারকে। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক হওয়ার কারণে তাদের জন্য আলাদা ভাবা শাসনব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ায় ১৯০০ সালের রেগুলেশন -এ পাহাড়ী জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ভূমির অধিকার, বিচার, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি অধিকারের আইনগত স্বীকৃত ছিল। সংশ্লিষ্ঠ ডেপুটি কমিশনারকে একক ক্ষমতা দেয়া হলেও সে সময় তাদের কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি না থাকায় তাঁরা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act. এর

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation 1881. অনুযায়ী পাহাড়ীদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল যা পাহাড়ীদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিল।[৪৮]

বর্তমান বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামের যে রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে তার সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলে হলেও Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act. এর কতিপয় ধারা ছিল প্রত্যক্ষভাবে উপজাতীয়দের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। ফলে তখন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন গোলযোগ দেখা যায়নি। এ কারণে ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক আন্দোলন ও তেমন সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বপ্রথম সংগঠন 'চাকমা যুবক সমিতি'। শুরুতেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবর্জিত থেকে কেবল শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে গঠিত হলেও পরবর্তীতে জাতীয় জাগরণের বীজ এই সমিতির মাধ্যমেই বপন করা হয়। ১৯১৮ সালে ঘণশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত 'চাকমা যুবক সংঘ' স্বল্প মেয়াদের হলেও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এর অবদান অপরিসীম। ১৯২০ সালে তৎকালীন নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি"। এই সংগঠনেও প্রথম দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়নি। দীর্ঘ ১৯ বছর পর্যন্ত শুধু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজের সাথেই এটি ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে যামিনী রঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা এ নেতৃত্ব গ্রহণ করলে এটিতে রাজনৈতিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিহাস বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতিই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির ইতিহাসে মাইল স্বরূপ। জনসমিতিই তৎকালীন সামন্ত প্রভু, তাঁবেদার ও ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের শাসন শোষণ এবং অত্যাচার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে থাকে এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির বিপরীতে নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের প্রগতিশীল রাজনীতিতে নিয়ে আসা শুভ সূচনা ঘটায়। ১৯৩৯ সালে রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শরৎচন্দ্র তালুকদার ও সুনীতি জীবন চাকমার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আর একটি সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি'। এটি মূলতঃ রাজকীয় আনুকূল্যে থেকে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার, ছাত্রদের মধ্যে নীতিজ্ঞান প্রচার ও ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা প্রসারের জন্য কাজ করে যায়।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

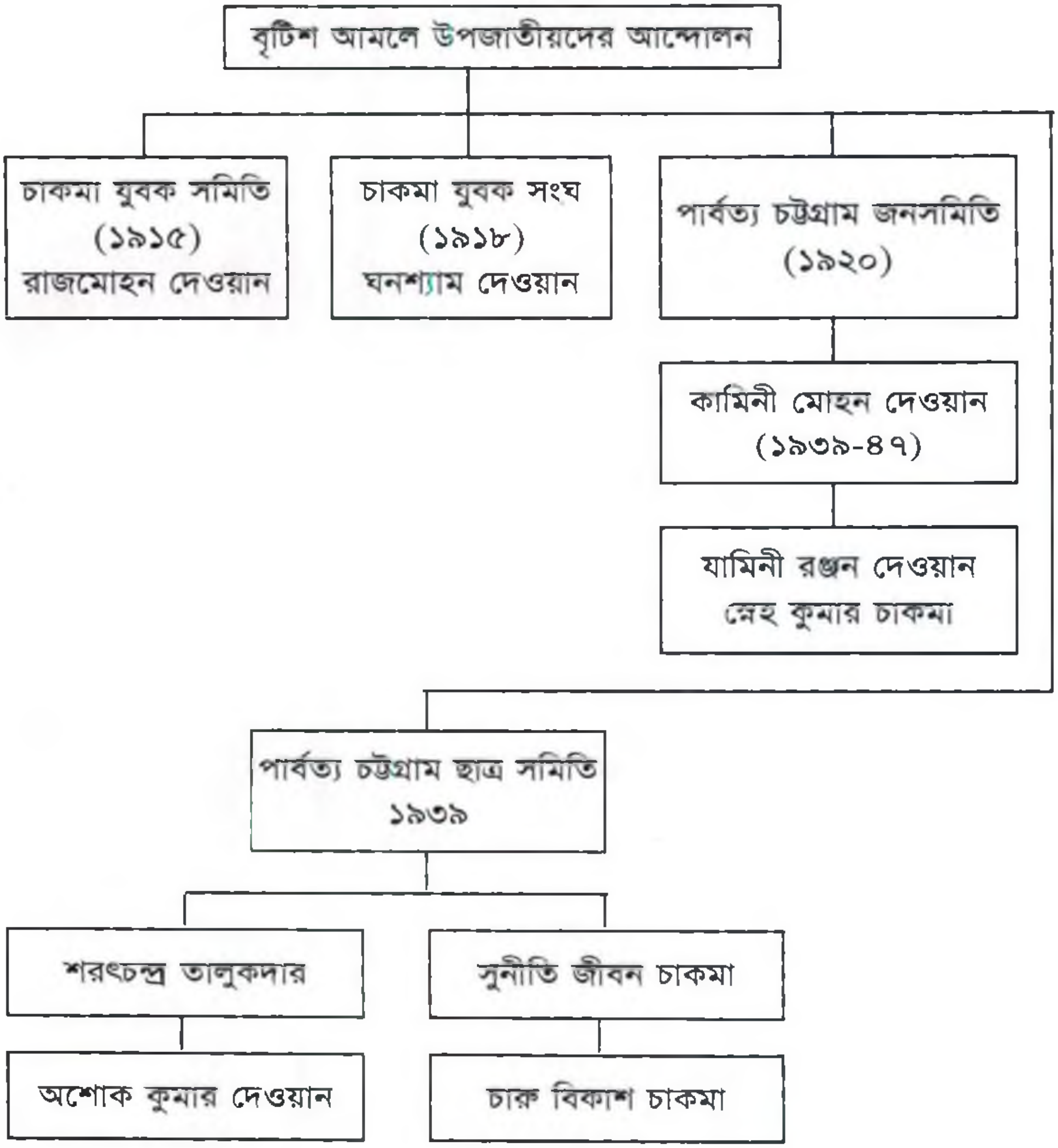

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক পটভূমি
এবং
রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তার
(১৯৪৭-১৯৭১)

৩.১ পাকিস্তান আমল

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত নামে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে এক স্বতন্ত্র্য স্থান লাভ করে। যদিও পরবর্তীতে ভারত বিভক্তিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ফর্মূলার অসাড়তা প্রমাণিত হয় এবং এটি যে একটি নিছক রাজনৈতিক কুটকৌশল তার রূপ বেরিয়ে আসে। Bengal Boundary Commission -এর ১৯৪৭ সালের ৮ই আগস্ট তারিখের স্কেচ ম্যাপ সীট অনুযায়ী পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমার পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তি এবং অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভূক্তির কথা ছিল ভারতের সাথে। কিন্তু পরবর্তীতে Major Billy Shont এর সুপারিশক্রমে র‍্যাডক্লিক ও মাউন্ট ব্যাটেন ৯ই আগস্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমার পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হবে। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৯৭% অমুসলিম, ভিন্ন ভাবাভাবি ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনের ঝড় ওঠে।[৫০] তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে Chittagong Hill Tracts People's Association প্রকাশ্যে ও সরকারীভাবে রাঙামাটিস্থ জেলা প্রশাসকের অফিসে ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। অনুরূপভাবে বোমাং সার্কেলের রাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় কয়েকব্যক্তিও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে বান্দরবানে বার্মার (মায়ানমার) পতাকা উত্তোলন করে। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের ২১শে আগস্ট পাকিস্তানের বেলুচ রেজিমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন

Dhaka University Institutional Repository

করে। তিনজন উপজাতির প্রধান পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি Native State হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতি দাবী জানিয়েছিলেন। এসব দাবী ব্যর্থতার পর্যবসিত হলে তারা ত্রিপুরা, কুচবিহার ও মেঘালয় সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এরপর পাকিস্তান সরকার ঢালাওভাবে উপজাতীয়দের প্রো-ইন্ডিয়ান বা ভারতপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্তি নিয়ে তৎকালীন নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ভারতপন্থী অধিবাসীরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে এবং বার্মাপন্থীরা বার্মায় চলে যায়। উক্ত পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত ও বার্মা (মায়ানমার) পাকিস্তানের কাছে অনুরোধ রাখে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক চাপ এড়ানোর জন্য পাকিস্তান সরকার ১৯০০ সালের Regulation বলবৎ রাখলেও কার্যতঃ বিশেষ জেলার মর্যাদা তুলে নেয়। ফলে উক্ত রেগুলেশন অর্থহীন হয়ে পড়ে। দেশ বিভাগের পর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনায় পাকিস্তানীদের মনোভাব স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল' অনুসারে অক্ষুন্ন রাখা হয়। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানেও এ অঞ্চলকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা রহিত করা হয়। এতে পার্বত্যবাসীর মনে ভয়, সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। স্বকীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির হেফাজত সম্পর্কে নতুন ভাবনা সমস্যার দোলায় দুলতে থাকে।[৫১]

পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কোনরকম মতামত না নিয়েই বিশেষ এলাকার মর্যাদা বাতিল করে দেন। এভাবে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার উপজাতীয়দের স্বাধীন জীবনে ছন্দপতন ঘটালেন। পাকিস্তান সরকারের আমলাতান্ত্রিক ও নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না পেরে বিপুলসংখ্যক উপজাতীয় মানুষ চিরকালের জন্য জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বার্মার আশ্রয় নেয়। ১৯৬৪ সালে প্রায় ৫০ হাজার উপজাতি নর-নারী ভারতে যান এবং ৩০ হাজার চলে যান বার্মায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মিরকে 'বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা' দেয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যে আইন সভার সম্মতি ব্যতিরেকে পার্লামেন্টে তার

Dhaka University Institutional Repository

সীমানা পরিবর্তন করে কোন বিল উত্থাপন করা যাবে না। বহিরাগতদের সম্পত্তি অধিকার ও সীমিত করা হয়েছে। এক বিশেষে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে এই স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে।[৫২]

১৯৪৮ সালে 'Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation 1881 এর মত একটি বিশেষ বাহিনী পাকিস্তান সরকার বাতিল করায় পাহাড়ী জনগণ বুঝতে পারেন তাদের উপর বিমাতাসুলভ আচরণের প্রদর্শন শুরু। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে পাকিস্তানীরা পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করে। যে Chitagong Hill Tracts Regulation 1900 Act কে পাহাড়ী জনগণের রক্ষা কবচ হিসাবে বলা হত। পার্বত্য জাতিসত্ত্বাসমূহের নিজস্ব ঐতিহ্য ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিসহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যাপারে যে বিধি ব্যবস্থা একটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল পাকিস্তান আমলে তা পদদলিত হয়।[৫৩] উক্ত রেগুলেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা যা ৩৪নং বিধি বলে ডেপুটি কমিশনারের উপর অর্পণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বিধি সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ১৫ বছর বসবাসরত ভূমিহীন বহিরাগত লোকদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার উক্ত ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকে দেয়া হয়।[৫৪]

এক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দা নির্ধারণে সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে বহিরাগত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভের পথ সুগম করে দেয়। প্রধানত: এই সংশোধনীর পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙ্গালীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৫১নং ধারানুসারে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির অবস্থানকে যদি বিপদজনক মনে করেন তাহলে পাহাড়ী জনগণে জীবন ধারার স্বার্থ বিরোধী হিসাবে তাকে গণ্য করে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহিষ্কার বা প্রবেশ করতে বিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন।[৫৫]

উক্ত আদেশ লংঘনের ক্ষেত্রে অর্থদন্ডসহ দু'বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় প্রকার দন্ডের বিধান রয়েছে। মূলতঃ পাহাড়ী উপজাতীয়দের অধিকারকে সংরক্ষণ ও অন্য জেলা থেকে এ জেলায় বসতি স্থাপনে বাধা দানের জন্য এ বিধি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হওয়ায় ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট মোস্তফা আনসারী বনাম ডেপুটি কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম গং মামলায় উক্ত বিধিকে বেআইনী ঘোষণা করায় তা রহিত হয়ে যায়।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ সমস্যার নতুন মাত্রা : কাপ্তাই বাঁধ

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন ধারায় আনে আমূল পরিবর্তন। এই বাঁধ নির্মাণ করার ফলে জনগণের জীবনে নেমে এসেছিল অভাবনীয় দু:খ-দুর্দশা, কিন্তু যে সময় কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না বলে এই বাঁধের বিরুদ্ধে তেমন ধরণের কোন বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিপুলসংখ্যক উপজাতির দেশ ত্যাগ কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউ.এস.এইডের ঋণের টাকায় ৫ বছর ধরে রাঙ্গামাটিতে বাস্তবায়ন করা হয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প।[৫৭] এতে এ অঞ্চলের মোট আবাদি জমির শতকরা ৪০ ভাগ (প্রায় ৫৫ হাজার একর জমি) সহ ২৫০ বর্গমাইল অঞ্চল জলমগ্ন হয়। প্রায় ১ লাখ চাকমা ও অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষ (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ৬০ হাজার কোন রকম ক্ষতিপূরণ পায়নি। ৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার কথা থাকলেও দেয় মাত্র ২৫ লাখ ডলার।[৫৮]

পাহাড়ীদের ঐতিহ্যগত জুমচাষ পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রকল্প এ অঞ্চলের জনগণের জীবন জীবিকা ও অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশের উপর একটি বড় আঘাত এনে দেয়। এর পরপরই ১৯৬৬ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালী পুনর্বাসন শুরু হয়। একদিকে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও অন্যদিকে পরিবেশগত হামলা সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে চরম অস্তিত্বের সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে। এভাবেই পাকিস্তান আমলে জাতিগঠন সংক্রান্ত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। কিন্তু তৎকালীন শাসকচক্র পাহাড়ী উপজাতিদের এই দু:খ দুর্দশার প্রতি ঘৃণাক্ষরে সুদৃষ্টি না দেয়ায় সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী ১১ দফা আন্দোলনে পাহাড়ী ছাত্ররা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম যোগদান করে। নিজেদের স্বতন্ত্র্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে নিজেদেরই মূল ভূমিকা রাখতে হবে এই বোধদয় পাহাড়ীদের মধ্যে জাগ্রত হতে থাকে।[৫৯]

কাপ্তাই বাঁধ পরবর্তী ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা ও প্রতিবাদ জানানো এবং ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালের ১৮ই জুন চট্টগ্রামে এম, এন, লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ট্রাইবাল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' উপজাতীয় জনগণের মধ্যে একটি প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন ছাত্রনেতা অনন্ত বিহারী খীসা এবং জে, বি লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি' (Chittagong Hill Tracts Tribal Welfare Assocation) ।

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিষদের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে গঠিত হয় 'নির্বাচন পরিচালনা কমিটি' এবং উত্থাপন করা হয় ১৬ দফা দাবী নামা' এতে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী ছিল অন্যতম।[৬৩] পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতির' নির্বাচনে পরিচালনা কমিটির নেতৃত্বে তৎকালীন পাকিস্তান গণ-পরিষদের এম.এন. লারমা আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে তারা রাজতন্ত্রকে সরাসরি আঘাত না করে রাজা ত্রিদিব রায়ের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। এটি ছিল মানবেন্দ্র লারমার কৌশলগত বিজয়। ১৯৭০ সালের ১৬ই মে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত হয় 'রাঙামাটি কমিউনিস্ট পার্টি'। এর প্রথম এডহক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম.এন.লারমা, জেবি লারমা, ভাবতোষ দেওয়ান, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, অমির সেন চাকমা ও কালী মাধব চাকমা প্রমুখ নেতা। ৬৯-এর গণ অভ্যূত্থান পরবর্তী এই পার্বত্য সংগঠন কোন রকম প্রচার না পাওয়ায় গোপন সংগঠন রূপেই থেকে যায়।

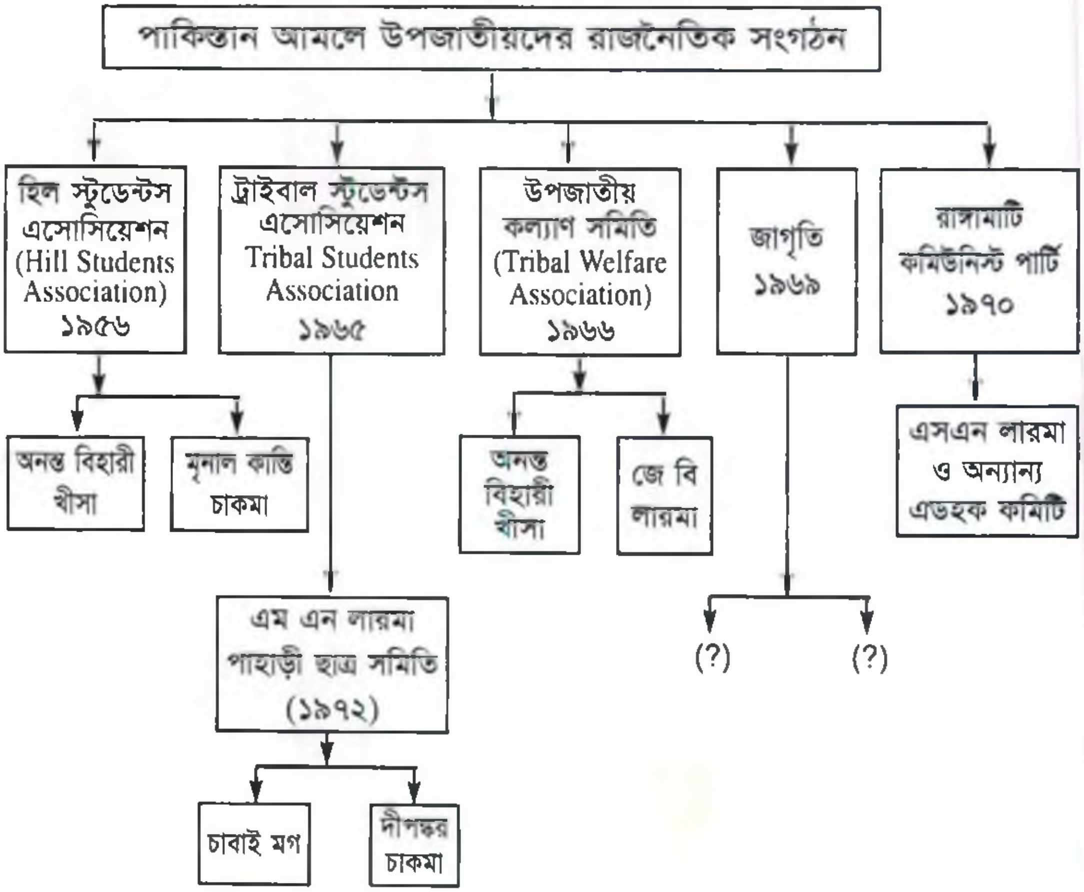

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি এবং তাদের দাবী-দাওয়া ও পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদসহ নানান সংকটসমূহ বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। উপরন্তু এই সংকট ক্রমাগত অবনতির দিতে যেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আহমদ মূসার বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন 'তথাকথিত দ্বি-জাতিতত্ত্বেরভিত্তিতে সৃষ্ট ফ্যানাটিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে জাতীয় সংখ্যালঘুরা অধিকার বঞ্চিত হবেন। এটি খুবই সুত্রাবদ্ধ বিষয়। কিন্তু উপজাতীয়দের উপর সেই নির্যাতন ও শোষণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত'।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ বাংলাদেশ আমল : মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবের শাসনকাল (১৯৭২-৭৫)

পাকিস্তান সরকারের ভারত বিরোধী মনোভাবের কারণে তার প্রভাব হিন্দুসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাসমূহের উপর পড়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্বল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কারণে এবং আওয়ামী লীগের যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে উপজাতিদেরকে সুসংগঠিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই সময় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে পাহাড়ী জনগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সঠিক পন্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে।[৬২] ঐতিহাসিকভাবে উপজাতির বিভিন্ন অস্ত্র চালনার পারদর্শী জেনে পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সুকৌশলে তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য লোভ কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনেও কার্পণ্য করেনি। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ রাজা ত্রিদিব রায়কে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কাজে ব্যবহার করেন। তৎকালীন স্পর্শকাতর ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা না হওয়ায় রাজা ত্রিদিব রায় দেশান্তরিত হন। তিনি চীন হয়ে পাকিস্তানে চলে যান এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরে তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন। এছাড়া তৎকালীন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ উপজাতীয় তরুণদের নিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করেন। পাকিস্তানের সামরিক কমান্ডাররা রাজাকার এবং সি এ এফ এ নেয়ার জন্য বিভিন্ন উপজাতীয় গ্রামের চেয়ারম্যান, হেডম্যান ও কারবারীদের বাধ্য করেছিল তাদের চাহিদা মতো উপজাতীয় লোকদের যোগান দিতে। অপরদিকে পাহাড়ী জনতার এক অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে ভারতে গমন করে।[৬২]

উপজাতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব এবং সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ উপজাতি গ্রামে অগ্নিসংযোগ এবং উপজাতি নিধনের ন্যায় মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা পানছড়িতে ১৬ জন উপজাতিকে হত্যা করলে দিঘীনালা ও বরকল এলাকাতে নির্যাতনমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় জড়িয়ে পড়া এবং কারো কারো ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের উপজাতি বিরোধী তৎপরতার জন্য কিয়দংশে দায়ী। বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী বা পাকিস্তানীদের সহযোগিতাকারী উপজাতিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও রক্ষীবাহিনীর সদস্যারা অস্ত্র উদ্ধার করার নামে কিছু কিছু উপজাতীয় গ্রামে এসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে উপজাতিদের উপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার, অবিশ্বাস ও উৎপীড়নের প্রতিবাদে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ১৯৭২ সালের ২৪শে জুন রাঙ্গামাটিতে গঠন করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি' নামে এক রাজনৈতিক সংগঠন। এর অংগ সংগঠন হিসেবে 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' নামে একটি ছাত্র সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করে।[৬৩] ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব নামে জনপ্রিয়) এর কাছে ৪ দফা দাবী পেশ করে। দাবী গুলো হচ্ছেঃ

১। Autonomy of the Chittagong Hill Tracts and the establishment of a special legislative body. (পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।)

২। Retention of the regulation of 1900 in the new constitution of Bangladesh. (উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির' অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।)

৩। Continuation of the offices of the Tribal Chiefs. (উপজাতি রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে।) এবং

৪। A constitutional Provision restricting the amendment of the regulation of 1900 and imposing a ban of Bangali settlement in CHT. (সংবিধানের ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।)

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করে সরাসরি দাবীগুলো প্রত্যাখান করেন। তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মধ্যে মিশে

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পাহাড়ীদের উপদেশ দেন। এই উপদেশ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চরম অবজ্ঞা। দেশগঠন ও জাতীয় সংহতি অর্জনের পথে শেখ মুজিবের এই সিদ্ধান্ত ছিল বৈপরিত্যে পরিপূর্ণ।

যার ফলে পাহাড়ীদের মধ্যে বাঙালী সত্ত্বা সম্পর্কে একটি ভয় এবং অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। এদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য হলেও তারা যে বাঙ্গালীদের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কোন অস্তিত্ব নয় এ ধারণা এবং সম্পৃতির ভাবাবেগ তাদের মজ্জের মধ্যে সরকারীভাবে বুঝানো হয়নি বলেই তৎকালীন সরকারের আন্তরিকতাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। ১৯৭২ সালের ২৯শে জানুয়ারী চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন যে, সরকারী চাকুরীতে আদিবাসীদের ন্যায্য অংশ প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, আদিবাসীদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। আদিবাসীরা তাদের ভূমির অধিকার পূর্বের মত ভোগ করতে পারেন।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণ-পরিষদের এক অধিবেশনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্য রখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন, "এ সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের কথা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগণ ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমল থেকে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। আমি দু:খের সাথে বলছি যে আমাদের জাতি সত্ত্বার কথা ভুলে যাওয়া হচ্ছে। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করতে চাই। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি রয়েছে। আমি সংবিধানে উপজাতীয় জনগণের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার আহবান জানাচ্ছি"।[৬৪]

১৯৭৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ এক ভাষা ও এক সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র' এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এক স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, "I am a Chakma, a Marma can never be a chakma, A chakma can never be a Bengali... I am a chakma, I am not a Bengali. I am Citizen of Bangladesh-Bangladeshi. You are also Bangladeshi but your national

Dhaka University Institutional Repository

identity is Bengali .... they (Tribal) can never be Bengalies."

তিনি আরও বলেন, "Our main worry is that our culture is tureatened with extinction... but we want to live with our separate identity."

১৯৭২ সালের ১৭ই জুলাই স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'লাল পতাকা'র কাছে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন করেছেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। এ- অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের ন্যায় সংগ্রাম দমনের নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ দমননীতি প্রতিরোধ সংগ্রামের শক্তি বাড়াবে।

কৃষক সমিতির জনৈক কর্মীর এক বিবৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকষর্ণ করা হলে তিনি বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন বিরোধী ভূমিকা তাদের নীতি ও আদর্শগত দেউলিয়াপনার স্বরূপ উদঘাটন করেছে। এটি তাদের জন্য মৃত্যুবান হবে"।

১৯৭৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাঙ্গামাটিতে এক নির্বাচনী সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, "আমরা এখন সবাই বাঙ্গালী, এখানে কোন উপজাতি নেই, আমি আজ থেকে আপনাদেরকে উপজাতি থেকে জাতিতে প্রমোশন দিলাম।" এই ঘোষণার সাথে সাথে শিক্ষিত পাহাড়ীগণ প্রতিবাদ মূখর হয়ে ওঠে। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশটিতে জাতিগঠন প্রক্রিয়া এভাবেই ভেঙ্গে পড়ে, যার জন্য দেশগঠনও বিলম্বিত থেকে যায়।

মুজিব সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে অভিযুক্ত করে এবং তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জুম্ম জাতির নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ফলে সামন্তবাদী রাজনীতির বিপরীতে উত্থান ঘটে মার্কসবাদী এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করেন। এভাবেই তিনি পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসলে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিতর কিভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে, তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ফলে সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির। 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' উপজাতীয়দের অধিকার ক্ষুন্ন করে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে এ ধরণের ধারণা পোষণ করতে থাকেন উপজাতীয় জনগণ। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' নামে আর একটি নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। যা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধবাদী স্রোতে অবস্থান নিয়ে জাতীয় সংহতি বিনষ্টের সূত্রপাত ঘটায়। শেখ মুজিবুর রহমান যেমন পাকিস্তান বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করে বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঠিক তেমনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বহিরাগত বাঙ্গালী বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে পাহাড়ীদের সমবেত করতে সমর্থ হন।[৬৫]

বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে উপজাতীয়রা তাদের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা না পেয়ে সরকারী বাহিনীর বিমাতাসূলভ আচরণ, হয়রানি, অত্যাচার ও পাশবিক নির্যাতনের প্রতিকার না পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রভাব খাটানোর জন্য "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" ১৯৭৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এটিকে নিছক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ফিরিয়ে দেন। সামাজিক অনাচার, অত্যাচার ও জাতিগত নিপীড়নের উপযুক্ত প্রতিকার ও ন্যায় বিচার না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যের ভাবনা নিজেরাই ভাবতে শুরু করে। আর এ লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন 'শান্তি বাহিনী'। খুব সম্ভবত চীন বিপ্লবের সফলতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন প্রভাবিত। হয়েছিলেন ভারতের নকশাল বাড়ী আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার। বাংলাদেশের সিরাজ সিকদারসহ আরো অনেক বামপন্থী নেতা। যার ফলে লারমা মাও সেতুং -এর গণযুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বনে প্রলম্বিত যুদ্ধের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মুক্তির লক্ষ্যে শান্তিবাহিনী গঠন করেন।[৬৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে জনসংহতি সমিতি সামন্ত বাদকে প্রধান শত্রু হিসাবে নির্ধারণ করে মাও সেতুং -এর গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানকল্পে কর্মসূচী প্রদান করে। রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি ও জনসংহতি সমিতির কোনটিই মার্কসবাদী সংগঠন ছিল না, যা তাদের দেওয়া চার দফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।[৬৭] ৪ দফা কর্মসূচীকে পাহাড়ীদের 'ম্যাগনা কার্টা' হিসাবে

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িত করা হলেও এখানে কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে উপজাতিদের মধ্যকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহুলোক শান্তিবাহিনীতে নিয়োগ লাভ করে এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য গভীর অরণ্যে একটি মিলিটারী একাডেমীও প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজাকার এবং সি এ এফ-দের লুকিয়ে রাখা অস্ত্র এবং পাক বাহিনীর ফেলে যাওয়া গোলাবারুদ দিয়ে শান্তিবাহিনীকে সশস্ত্র করা হয়। এ সময় বার্মার কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথেও একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর ভারতের 'নাগ' ও মিজো' বিদ্রোহীদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে জনসংহতি সমিতির সমগ্র কার্যাবলী ও শাখাসমূহের একটি ছক বিধৃত হল:

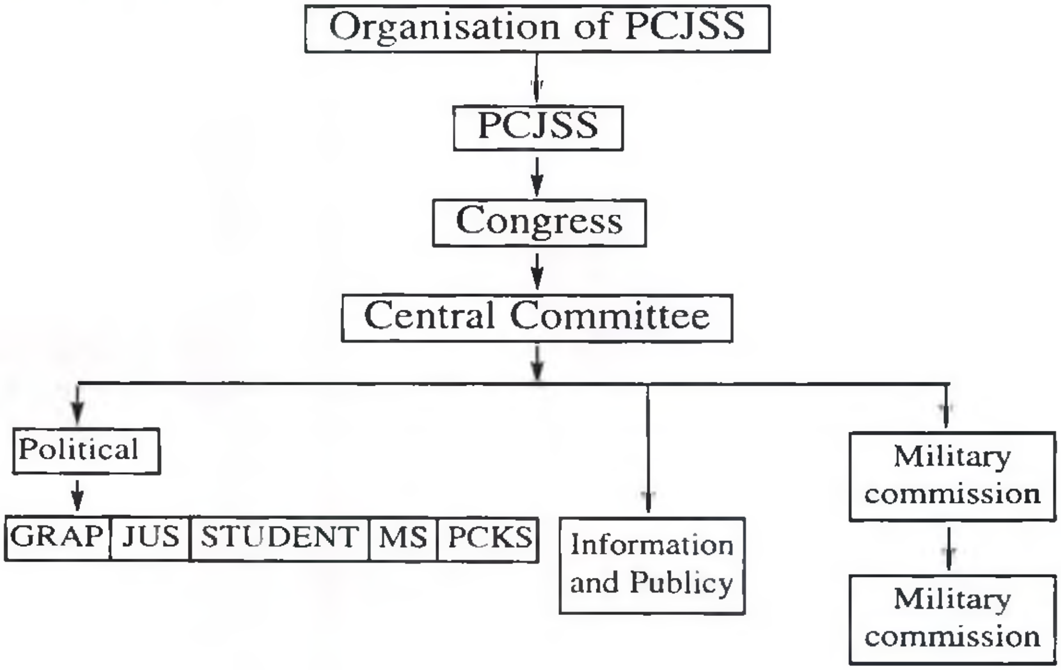

LEGEND

PCJSS = Parbatya Chattogram Jana Sanghati Samittee	
GRAP = Gram Panchayet	
JUS = Jubo Samiti	
MS = Mahila Samiti	
PCKS = Parbatya Chattogram Kyattanya Samiti	
GHQ = General Head Quarters	

Dhaka University Institutional Repository

ORGANISATION OF INSURGENT ARMED CADRE

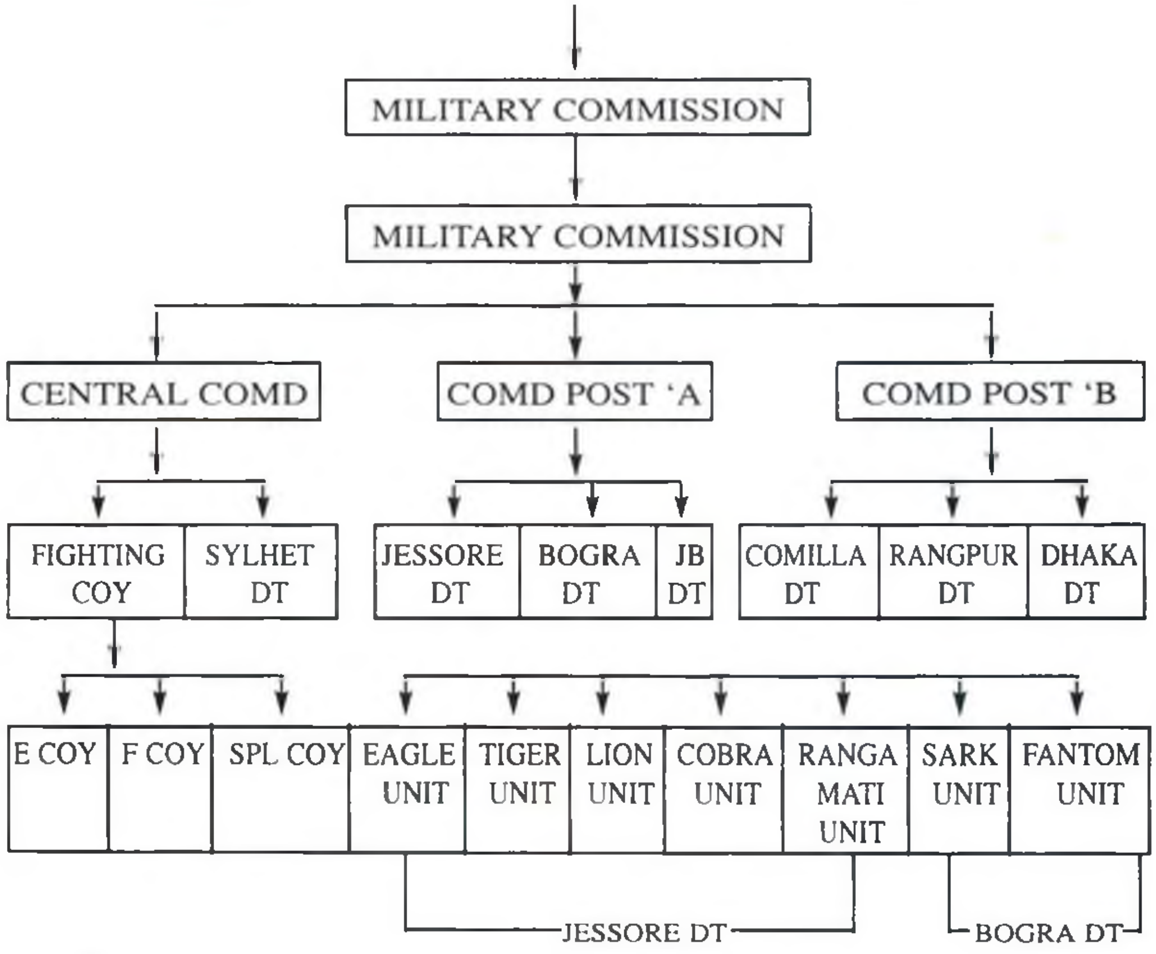

LEGEND

FC	=	FIELD COMMANDER
DFC	=	DEPUTY FIELD COMMANDER
COMD	=	COMMANDER / COMMAND
DT	=	DISTRICT
SPL	=	SPECIAL
JB	=	JESSORE BOGRA
COY	=	COMPANY

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন গণদাবী ও ছাত্র দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ৯ই জুন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করে। ঐ স্মারক লিপিতে যে সব দাবী তোলা হয় তা নিম্নরূপ :

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের জন্য সমাজতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল বা গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল চাই।

২। কাপ্তাই বাঁধ মরন ফাঁদের জল আর বাড়ানো চলবে না।

৩। মাইনী এলাকার গণ নির্যাতনকারী, নারী ধর্ষণকারী জল্লাদ বেনিয়া ইয়াহিয়া ও হিটলারী বাহিনীর শিষ্যদের উপযুক্ত বিচার চাই এবং গণহত্যা ও লুটতরাজ, রাহাজানি অবিলম্বে প্রতিরোধ করা হোক। এর সুষ্ঠু তদন্তের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট আবেদন।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অন্যায়, অত্যাচার দূর করে শোষক শোষিতের মূল্যায়ন একই মাপকাঠিতে করে সত্যিকার সমাজতন্ত্রের বিকাশ চাই।

৫। অনতিবিলম্বে পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করা হোক।

৬। অন্যায়ভাবে আটককৃত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক।

৭। কালো বাজারীদের দমন কর দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনা হোক।

৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের জন্য আরো অধিক সংখ্যক মহাবিদ্যালয়, কারিগরি মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং জনসাধারণের দারিদ্রতা হেতু অষ্টম মান পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উপজাতীয় শিক্ষা তহবিল গঠন করা হোক।

৯। রামগড় থানার ফেনী উপত্যকার জমি বেদখলকারীদর অপসারণ করে জমির প্রকৃত মালিকদের নিকট জমি ফিরিয়ে দেয়া হোক।

১০। উপজাতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নিজস্ব ভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

চাবাই মন (সভাপতি), বিশ্বকীর্তি ত্রিপুরা (সহ-সভাপতি) দীপঙ্কর চাকমা (সাধারণ সম্পাদক) স্বাক্ষরিত এই দশটি দাবী ছিল ছাত্র জনতার দাবী-পার্বত্য চট্টগ্রামের গণদাবী। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, শোষণ ও নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে আশা উপজাতীয়দের মধ্যে জেগে উঠেছিল তৎকালীন আওয়ামীলীগ শাষকগোষ্ঠী তা পূরণে সফলকাম হয়নি। তাই একটি চাপা অভিমান ও ক্ষোভ তাদের মধ্যে সুপ্ত থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদার দাবীকে শেখ মুজিবুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে মেনে না নিলেও এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দিলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজেই বাকশালে (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) যোগ দেন। বাকশালে যোগদানকারী অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতা অনন্ত বিহারী খীসা, বামপন্থী তাত্ত্বিক মিঃ চারু বিকাশ চাকমা, প্রাক্তন ছাত্র নেতা জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং মারমা সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক নেতা কে.এস.প্রু অন্যতম। তৎকালীন বাকশাল সরকার অনন্ত বিহারী খীসাকে খাগড়াছড়ি, চারু বিকাশ চাকমাকে রাঙ্গামাটি, কে. এস. প্রু -কে বান্দরবান জেলা কমিটির সম্পাদক নিয়োগ করেন। মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা হন গভর্ণর। মুজিব সরকারের শাসনামলে ভারত শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে সতর্ক করে দেয়। জানা গেছে 'বাকশাল' গঠন করার পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সামরিক অভিযানের একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল সে সময়কার গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টিকে দমন। কিন্তু গোপন উদ্দেশ্য ছিল শান্তিবাহিনী এবং তখনকার দিনে পালিয়ে থাকা ভারতীয় মিজো বিদ্রোহীদের দমন করা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটায় ভারত অন্য কুটকৌশল গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যাঞ্চলে মিজো গেরিলা যেন আশ্রয় না পায় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সরকার যেন হুমকীর সম্মুখীন থাকে এ উদ্দেশ্যে ভারত শান্তি বাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে আশ্রয় দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের তৎপরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে। বাকশাল সরকারের পতনে সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লালমা আত্মগোপন করেন। পরে প্রকাশ্যে আসতে চাইলেও বিরাজমান অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সময়ে একদিকে যেমন শান্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে জিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য এলাকায় বাঙ্গালী বহিরাগত পূনর্বাসন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ জিয়া সরকারের আমল (১৯৭৫-৮১)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার ভেতর দিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। রাজনীতিতে প্রচলিত শত্রু-মিত্রের ধারনা পাল্টে যায়। জানা গেছে যে, ভারত 'জসস' (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি)-কে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। সেই ভারতই নাকি তার গোয়েন্দা শাখা RAW এর (Research and Analysis Wing) মাধ্যমে 'জসস' এর সাথে যোগাযোগ করেছিলো। অন্যদিকে বাকশাল সরকারের পতনে সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার কারণে এম এন লারমা আত্মগোপন করেন।[৬৮]

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার এই সময় ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে অভিহিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করলেও পাশাপাশি বিদ্রোহ দমনের নামে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উক্ত উন্নয়ন বোর্ড তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি, যাতে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাবলম্বীতা ফিরে আসবে। এই সময় দীঘিনালায় জনসংহতি সমিতির প্রধান কার্যালয় ও শান্তিবাহিনীর জেনারেলের হেড কোয়াটার স্থাপন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অবস্থান বেশ সুসংহত হয়। এ সময় তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছিলো বলে অনুমান করা হয়।[৬৯]

এই সময় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৬টি সেক্টরে, প্রত্যেক সেক্টরকে ৪টি জোনে এবং প্রত্যেক জোনকে কয়েকটি সাব জোনে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের শুরুতেই শান্তি বাহিনীর সামরিক এ্যাকশন কর্মসূচী আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথমদিকে কর্মসূচী ছিল থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ এবং পরবর্তীতে ব্রীজ, কালভার্ট, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সুযোগ মতো বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর আক্রমণ করা।

১৯৭৭ সালের ২৯শে মে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা চন্দ্রঘোনা এলাকায় এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যকে হত্যা করে। এতে স্থানীয় প্রশাসন

Dhaka University Institutional Repository

ও সেনাবহিনীর মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তখন শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সংঘর্ষ মোকাবেলা উদ্দেশ্যে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা লাভের জন্য সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন ১৯৭৭ সালের ২রা জুলাই রাঙ্গামাটিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভা আহবান করেন। এই সভায় ট্রাইবেল কনভেনশন নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গঠন করা হয়।[৭০] এই সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবী-দাওয়া সহিংস পন্থার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আদায় করা সম্ভব বলে এই পন্থায় আন্দোলন চালানোর জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানানো হয়। ট্রাইবেল কনভেনশন ভবিষ্যতে শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতি এবং সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা ব্যাপারে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে বলেও এই সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের নামে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, বিনা বিচারে আটক, ধর্ষণ, অযথা হয়রানি, চলাচলে বাঁধা, বৌদ্ধ মন্দির লুণ্ঠন। এতে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয়। তারপর সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দীঘিনালা, রুমা ও আলীকদমে তিনটি সুবৃহৎ সেনানিবাস নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া সেনা ছাউনী, আধা সামরিক ক্যাম্প এবং পুলিশ ক্যাম্প সকল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় স্থাপন করা হয়। সকল রাস্তা ও নদীপথে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়। বিদ্রোহ দমন প্রশিক্ষণের জন্য মহালছড়ি, ধূল্যাছড়িতে নৌঘাটি স্থাপন করা হয়। বিমান বাহিনীকে তৎপর করা হয়। সেনাবাহিনী ও পাহাড়ী জনগণের অনুপাত দাড়ায় ১:৫।[৭১]

১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল রাত দু'টায় রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বাসায় হামলা চালিয়ে প্রায় ৭০ জন যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা ও শিশুদেরকে বিনা পরোয়ানায় বা অভিযোগে আটক করা হয়। আটকের উদ্দেশ্য ছিল অযথা হয়রানি ও অত্যাচার। ১৬ই মার্চে খাগড়াছড়ির খবংপড়িয়া গ্রামের পাহাড়ীদেরকে গাছে ঝুলিয়ে বেদম প্রহার করা হয়। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বীতার নামে যৌথ খামার নামক বন্দি শিবিরে আটক করা হয়। ফলে পাহাড়ীদেরকে তাদের স্বহস্তে গড়া আবাদী জমি, শস্যক্ষেত্র, ঘরবাড়ী রেখে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত যৌথ খামারে আশ্রয় নিতে হয়। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে।[৭২] যৌথ খামারের পিছনে সরকারের কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এ যৌথ খামার সৃষ্টি করা হয়। সাধারণ জনগণ তথা দেশ-বিদেশের জনগণের নিকট বুঝানো হয় যে, সরকার অনুন্নত পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সার্বিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতিকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সুস্থ জীবন ধারার নিশ্চয়তা দিচ্ছে; কিন্তু এ কর্মকান্ডে সরকারী ইচ্ছার চূড়ান্ত রূপটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সামরিকভাবে দমন নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠে সামরিক কর্তৃপক্ষের আয়োজিত ১৯৭৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির জনসভায় চট্টগ্রাম সেনানিবাসের এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মঞ্জুরের বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি পার্বত্য জনগণকে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, "আমরা তোমাদের চাই না, তোমরা যেখানে খুশী চলে যেতে পারো"।[৭৩]

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অত্যন্ত সংঘাতময় ছিলো। এই সময়ে শান্তি বাহিনী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং সরকারী বাহিনী ও শান্তি বাহিনী যথেষ্ঠ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১৯৮০ সালের মার্চের ১ম ভাগে শান্তিবাহিনীর গেরিলা হামলায় ২২ জন সৈন্য ও ১জন অফিসার নিহত হবার সাথে সাথে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের মত আর একটি '২৫শে মার্চ' নেমে আসে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী থানাধীন কলমপতি ইউনিয়নের পাহাড়ী জনগণের উপর ১৯৮০ সালে।[৭৪] স্থানীয় পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দির মেরামত করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে হাজির হওয়ার জন্য স্থানীয় সামরিক কমান্ডার নির্দেশ দেন। এতে সবাই বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গনে হাজির হলে জনৈক ক্যাপ্টেন কামাল উপস্থিত সবার উপর অতর্কিত গুলি ছোড়ার নির্দেশ দেন। এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় তিন শতাধিক বৌদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এই ঘটনার পর একই বৎসরে বহিরাগত বাঙ্গালীদের দ্বারা উপজাতীয়দের উপর বেশ কয়েকটি আক্রমন পরিচালিত হয়। যেমনঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর রাইথ্যাবিলিতে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বাউরা পাড়ায়, ১৯শে নভেম্বর উপলছড়ি গ্রামে, ২৯শে নভেম্বর লংগদুতে, ১১ই ডিসেম্বর নোয়াপাড়া ও বিধন কার্বারীর গ্রামে এবং ২৩ শে ডিসেম্বর দাতবদুপ্যায়।[৭৫]

কাউখালী বাজারের ঘটনার পর দেশের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তিনজন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের দ্বারা একটি তদন্তকারী কমিটি গঠিত হয়। যার সদস্য ছিলেন যথাক্রমে রাশেদ খান মেনন, শাহজাহান সিরাজ ও উপেন্দ্র লাল চাকমা। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ২৫শে এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে কলমপতি হত্যাকান্ডের নিন্দা করে অবিলম্বে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবী জানান এবং সরকারের নিকট নিম্নলিখিত দাবীসমূহ পেশ করেন:

১। বেসরকারী প্রশাসনের স্বার্থে সেনাবাহিনীর অপারেশন বন্ধ।

২। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে অবিলম্বে আলোচনা করা এবং কলমপতিসহ অন্যান্য ঘটনার তদন্ত, বিচার ও শ্বেতপত্র প্রকাশ।

৩। বিভিন্ন জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থীদের পুনর্বাসন বন্ধ।

৪। শরনার্থীদের অবিলম্বে ফিরিয়ে নেওয়া।

৫। নির্যাতিত ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বিধস্ত বৌদ্ধ মন্দির পুন:নির্মাণ এবং

৬। বাজারে বেচা-কেনার জন্য বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার।

সরকার সংসদে কলমপতি গণহত্যার তদন্ত চাইল না, শুধুমাত্র নিন্দা করে একটা বিবৃতি দিল। কলমপতি ভয়াবহ হত্যাকান্ডের রক্তের দাগ ম্লান না হতেই ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে জিয়া সরকার সংসদে দূর্গত এলাকা বিল (Disturbed Area Bill) পাশের জন্য প্রস্তুতি নিলে বিরোধী দলগুলো আপত্তি উত্থাপন করে। এই বিল উত্থাপনের পর পাহাড়ী জনগণ সরকারের সদিচ্ছার উপর পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে মুক্তির পথ হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করে। এই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বা সেনাবাহিনীর নন কমিশন্ড অফিসার যে কোন ব্যক্তিকে বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার কিংবা গুলি করার নির্দেশ দিতে পারবে। বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী, অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করার সন্দেহে যে কোন বাড়ী পোড়াতে বা জমি ক্রোক করতে পারবে। এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না।[৭৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ট্রাইবেল কনভেনশনও কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ট্রাইবেল কনভেনশনের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য নিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ থাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে কোন সমঝোতার পরিবেশ গড়ে উঠেনি। ফলে পাহাড়ী জনগণ নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৮০ সালে রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে সাবেক প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমান এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করলে তিনি এ প্রশ্নের উত্তর পরে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। এই আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে সফল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।[৭৭]

বস্তুত: জেনারেল জিয়ার আমলে সরকারী উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুলসংখ্যক বাঙালীদের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের অতি মাত্রায় সক্রিয় তৎপরতার ফলে উপজাতীদের মধ্যে বেশী করে বিচ্ছিন্নতা বোধ জন্মায় এবং বেশ কয়েক হাজার উপজাতি সদস্য দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্ন একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়।[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ প্রেসিডেন্ট সাত্তারের শাসনামল (১৯৮১-৮২)

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি সমাধানের আলোকে ১৯৮২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির উপজাতীয় বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ও অপাহাড়ীদের একটা প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন।[৭৯] তবে সমস্যা সমাধানে কোন সুনির্দিষ্ট ফর্মূলা উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতি সাত্তার ক্ষমতায় আসার পর সামস্যা সমাধানে কোন উন্নতি হয়নি।[৮০] বরং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জিয়া সরকারের আমলে শিক্ষাচাকুরী ক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সাত্তার সরকার আমলে তা লুপ্ত হয়ে যায়।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ জেনারেল এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০)

১৯৮২ সালে এরশাদের সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে। এরশাদ সরকারও প্রথম দিকে সামরিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে। ফলে সমস্যা ও অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়। এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের শাসনামলে পাহাড়ীদের মাঝে বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এরকম নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি নিয়ে হাজার হাজার উপজাতীয় মানুষ সীমান্তের ওপারে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৮২]

পার্বত্য অঞ্চলে সরকারীভাবে পুনর্বাসন এরশাদ আমলেও বন্ধ হয়নি। যদিও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ সরকারীভাবে এই বাঙ্গালী পুনর্বাসনের উদ্যোগের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন; কিন্তু কখনও তা ফলপ্রসূ হয়নি। বাঙ্গালী পুনর্বাসন নিয়ে শুধুমাত্র সরকার ও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে মন কষাকষি হয়নি, সাথে সাথে পুনর্বাসিত বাঙ্গালী ও স্থানীয় পাহাড়ীদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। পাহাড়ীরা জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারী নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত না থাকায় প্রায় ক্ষেত্রেই বন্দোবস্ত ছাড়া তারা আবাদ ও ভোগদখল করতো। যেসব এলাকায় বাঙ্গালী পূনর্বাসন করা হয়েছিল, তা ছিল পাহাড়ীদের দখলীয় খাস জমি। বাঙ্গালীদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন পুনর্বাসিত বাঙ্গালী নিজ বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পাহাড়ী জমি সংলগ্ন পাহাড়ীদের বন্দোবস্ত অথবা খাস দখলীয় জমি স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের যোগসাজশে অনেকটা জোরপূর্বক দখল করে। এতে স্থানীয় পাহাড়ী ও পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বিরোধ দিন দিন দানা বাঁধতে থাকে। যা পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে লাভবান হয় সরকার। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পাহাড়ীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্থান ত্যাগ করলে বাঙ্গালী পুনর্বাসিতরা তা সরকারী মদদে দখল করে নেয়।[৮৩]

১৯৮৬ সালে এপ্রিল - মে -জুন মাসের বিভিন্ন সময়ে শান্তিবাহিনী পানছড়ি, দিঘীনালা, মাটিরাঙ্গা এবং ২রা জুন লংগুদু ও ২৭শে জুলাই লক্ষ্মীছড়িতে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের উপর আক্রমন চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করে। পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের উপরে

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা ১৯৮৬ সালের ১লা মে পানছড়ি, ১৮ই মে মাটিরাঙ্গা থানার গৌরাঙ্গপাড়া, ১৩ ও ১৪ই জুন দীঘিনালা থানাধীন রেংকায্যা, ছোট মেরুং, বড় মেরুং, বোয়ালখালী, তারাবুনিয়া, বানছড়া, কবাখালী, পাবলাখালী, দীঘিনালা ও কাটারং মৌজার বসবাসকারী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর গ্রামসমূহে হামলা চালিয়ে শত শত বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, গরু-ছাগল, হাস-মুরগীসহ লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল লুট ও পাহাড়ীদের হত্যা করে। এতে পাহাড়ীরা ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়। কিছুসংখ্যক পাহাড়ী দেশে ফিরে আসলেও অধিকাংশই শরনার্থী হিসাবে জীবন ধারণ করছে।[৮৪]

উপজাতীয়দের সীমান্তের অপর পাড়ে জোরপূর্বক ধরে নেয়া শান্তিবাহিনীর একটি কৌশল, যাতে সমস্যাটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়া যায়। এছাড়াও শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অ-উপজাতীয়দের হত্যা যাতে করে অ-উপজাতীয়রা উপজাতীয়দের উপর নির্যাতন করে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে। এর ফলে শরনার্থী সংখ্যা বাড়ে।

এসব নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কথা উঠলে এরশাদ সরকার ভারত থেকে পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার জন্য পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানে উদ্যোগ নেয়। শুরু হয় জনসংহতি সমিতির নেতাদের সাথে গোপন যোগাযোগ।[৮৫]

জনসংহতি সমিতির সাথে এরশাদ সরকারের দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। সেখানে জনসংহতি সরকারের কাছে ৫ দফা দাবীনামা পেশ করে। দাবীগুলো হলোঃ

১। পার্বত্য অঞ্চলকে প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান।

২। পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মতামত ব্যতিরেকে যাতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনিক মর্যাদা পরিবর্তন করা না হয় সে ব্যাপারে সাংবিধানিক বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করা।

৩। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্টের পর পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী অ-উপজাতীয়দের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেয়া।

৪। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অর্থ সরবরাহ করা ও

Dhaka University Institutional Repository

৫। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উক্ত ৫ দফা দাবী সরকারের পক্ষে আলোচনার জন্য গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে বলা হয় যে, পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসনের দাবী সংবিধানের পরিপন্থি।[৮৬] কারণ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার কোন বিশেষ এলাকার জন্য প্রাদেশিক মর্যাদাসহ স্বায়ত্বশাসন প্রদান সাংবিধানিকভাবে অসম্ভব। সরকার পক্ষ জনসমিতির নেতৃবৃন্দকে তাদের দাবী সাংবিধানিক কাঠমোর মধ্যে পুনঃ পেশ করার জন্য অনুরোধ জানায়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সরকার পক্ষ সমিতির কাছে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন--

১। জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আইনগত এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সমিতির নেতৃবৃন্দের আলোচনার ব্যবস্থা করা।

২। জনসংহতি সমিতি কর্তৃক এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করা যিনি মন্ত্রীসভার সদস্যভূক্ত হবেন।

৩। ৫ দফা দাবী সরাসরি প্রেসিডেন্ট অথবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জি.ও.সি-র কাছে গোপনে পেশ করা।

৪। ৫ দফার বিকল্প হিসাবে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক নতুন প্রস্তাব পেশ করা।

উক্ত প্রস্তাবসমূহ জনসংহতি সমিতি গ্রহণ না করায় তৃতীয়বারের মত সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা সমাপ্ত হয়। এর পর ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে ৪র্থ বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে সরকার ৫ দফা দাবী যুক্তিসংগত নয় বিধায় আলোচনা করতে পুনরায় অসম্মতি প্রকাশ করে। সরকার পক্ষ এসব দাবী সংবিধান পরিপন্থি বলে আখ্যায়িত করে এবং আলাদা একটা ৯ দফা দাবী শান্তি বাহিনীকে গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এসব টানাপোড়ন সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে ৬ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখ, উক্ত বৈঠকে সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন শব্দটি অন্তর্ভূক্ত করে পূর্বোক্ত ৫ দফা দাবী উত্থাপন করে। আর সরকার পক্ষ স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে উক্ত বিষয় দাবীর অন্তর্ভূক্ত নয় বিধায় সমিতি আলোচনা করতে অস্বীকার করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে কতিপয় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির এক সমঝোতা চুক্তি সই হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।[৮৭]

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সরকারের আলোচনা চলাকালে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার নেতা চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় (রাজা ত্রিদিব রায়ের ছেলে) আলোচনা থেকে সরে যান এবং ঘোষণা দেন যে, জেলা পরিষদ গঠন করে পার্বত্য সমস্যার সমাধান আসবে না। চাকমা রাজা নেতৃত্ব থেকে সরে গেলে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার পক্ষে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শান্তিময় দেওয়ান। আলোচনা চলাকালীন সময়ের মধ্যে ১৯৮৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর রাঙামাটি রিজার্ভ বাজারে দেওয়ান নিহত হন এবং ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনসংহতি সমিতি সরকারের আলোচনার রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

তারা অজুহাত দেখায় যে, পার্বত্য জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে এই চুক্তি পার্লামেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ১৯৮৯ সালের ৬ই মার্চ সরকার জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ বিল পাশ করিয়ে নেয়।

পাহাড়ী নেতাদের অভিযোগ : শুধুমাত্র পরিষদ গঠন প্রণালী ছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে দেশের অন্যান্য জেলা পরিষদের কোন তফাৎ নেই।[৮৮]

জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সরকার নিজস্ব ফায়দা হাসিলের জন্য রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯ ও পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) বিল ১৯৮৯ সংসদে উত্থাপন করেন। আর পার্বত্য জেলাসমূহ বিল ২৫শে ফেব্রুয়ারী ও তিনটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংসদে পাশ হয়।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসারে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর পরিষদের চেয়ারম্যান অবশ্যই পাহাড়ী হবেন। সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন জমি ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলের সকল প্রকার জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের চূড়ান্ত আদেশের ক্ষমতা পরিষদের কাছে থাকবে। স্থানীয় সরকার

Dhaka University Institutional Repository

আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পরিষদের পরিচালনাধীন সকল বিষয়ের উপর এ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য, কলা, প্রাথমিক শিক্ষা, ইউ.এস.এফ, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি, সমবায়, পুলিশ, আদিবাসী সামাজিক আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও হাট-বাজার বিভাগগুলি পরিচালনার জন্য পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।[৮৯]

জনসংহতি সমিতি স্থানীয় সরকার পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ তথা ৯ দফা রূপরেখার তীব্র বিরোধীতা করে এবং তাদের দেয়া ৫ দফা বাস্তবায়নের সক্রিয় থাকা সত্বেও ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই নির্বাচনে উপজাতীয় জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেনি। তবু জনসংহতি সমিতি বা শান্তি বাহিনীর পক্ষে এই নির্বাচন বানচাল করাও সম্ভব হয়নি। বস্তুত: পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের প্রশ্নে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

(৩.৭) ৯০ এর গণ অভ্যুত্থান ও পরবর্তী পরিস্থিতি বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল

১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের পর জেনারেল এরশাদের পতন ঘটে। তৎকালীন তিন বিরোধী জোটের আহবানে নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল এরশাদের পতনের পর ঢাকা ও চট্টগ্রামে অধ্যয়নরত পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী ছাত্ররা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি বাতিলের দাবীতে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করে। আর পাহাড়ী শরনার্থীদের ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা এবং ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলার সংসদ নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী জানায়। তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৩০শে ডিসেম্বর রাঙামাটি সফরে আসার পর স্থানীর সরকার পরিষদগুলি বাতিল করা হবে না বলে ঘোষণা দেন। সরকার পরিচালনার ব্যাপারে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রুটিন মাফিক কাজ ছিল বলে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।[৯০]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমল (১৯৯১-৯৬)

এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ সরকারের পতনের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারী '৯১ এর নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রচেষ্টার কোন হেরফের না হয়ে বরং তা নতুন মাত্রায় অব্যাহত থাকে।

যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বে ৯২ এর ৯ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে। ফলশ্রুতিতে শান্তিবাহিনী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এসময় সরকারের পক্ষ থেকেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

খালেদা জিয়ার আমলে সরকার ও উপজাতীয়দের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে ৭টি এবং সাব কমিটি পর্যায়ে রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মে মাসে জনসংহতি সমিতি ৪টি দাবী সম্বিলিত একটি ঘোষণা পত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করে। দাবীগুলো হলোঃ

ক) যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ ১-২০ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রাখার আহবান।

খ) ৫ এপ্রিলের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আহবান জানায়।

গ) ১৪ জন শান্তিবাহিনী সদস্যের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী।

ঘ) যদি এই শর্তগুলো সরকার মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে জনসংহতি সমিতি পঞ্চম সাব কমিটির বৈঠক বর্জন করবে বলে ঘোষণা করে।[৯১]

খালেদা জিয়ার সরকার প্রথম দিকে কিছুটা পদক্ষেপ নিলেও কিছুদিন পরেই সমস্যা সমাধানের জন্য যে আন্তরিকতা দরকার তা হারিয়ে ফেলেন। তাই সাবকমিটির নেতা রাশেদ খান মেনন বলেছিলেন, "পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সরকারী আগ্রহের অভাব রয়েছে।"

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় লিয়াজোঁ কমিটির নেতা হবস্‌ দেওয়ান চাকমা BBC'র Richard Galpin সাংবাদিককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "যুদ্ধবিরতি অবস্থার ভিত্তি অত্যন্ত ভঙ্গুর, শান্তি আলোচনার ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন।"

৯৫ সালের ২২জুন শান্তিবাহিনীর সাথে সরকারী বাহিনীর গুলি বিনিময়ে ১ জন সৈন্য নিহত হলে এলাকায় আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।[৯২]

৯৪ সালের ২০ অক্টোবর খাগড়াছড়ির সাংসদ কল্পনা রঞ্জন চাকমা পদত্যাগ করে সরকারের বিরুদ্ধে সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার অভিযোগ এনে ভোরের কাগজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পূনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কিছুই রক্ষা করেনি। এ ব্যাপারে সরকারের কোন আন্তরিকতা আছে বলে মনে হয় না।'

বিগত সরকারের আমলে সরকার প্রধানগণ সমস্যা সমাধানের জন্যে যেটুকু আন্তরিক ছিলেন খালেদা জিয়ার ততটা আন্তরিক ছিলেন না যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে কল্পনা রঞ্জন চাকমা ও রাশেদ খান মেননের কণ্ঠে। অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি চরম আকার ধারন করে। সরকারের সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ হতে থাকে। এ সংঘর্ষে বাঙ্গালী উপজাতি উভয়পক্ষের সদস্যরা হতাহত হতে থাকে। সরকারী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হলেও সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হয়নি।[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে গৃহীত উদ্যোগঃ

পূর্বের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, উপজাতি সমস্যা মুঘল ও ইংরেজ উভয় শাসনামলেই ছিল কিন্তু মুঘল ও ইংরেজ আমলে সমস্যার মূলত: একটি দিকই ছিল খাজনা বা করের সমস্যা। মুঘল আমলে এ সমস্যা খুব একটা প্রকট আকার ধারণ করেনি। ইংরেজ আমলে প্রশাসকরা অত্যন্ত সুকৌশলে সমস্যার সমাধান করেছেন। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক উন্নতির কোন প্রচেষ্টাই করা হয়নি। ফলে উপজাতীয়রা আধুনিকতার কোন স্পর্শই পাননি। সুতরাং সমস্যাও ছিল কম।

পাকিস্তানী আমলে ভুল রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে সমস্যা শুরু হয়। ওখানকার অর্থনৈতিক সমস্যা প্রথম যে কারণে অর্থাৎ কাপ্তাই বাঁধ, সে বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। বরং কাপ্তাই বাঁধের ফলে উর্বর ভূমিহারা লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণবসতি স্থাপন করলেও পূর্বের পূর্বের ন্যায় স্বাচ্ছন্দ অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। যে শিল্প কারখানা ওখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে উপজাতিরা কারিগরী ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে চাকুরী পাচ্ছে না। অন্যদিকে পাকিস্তান আমল থেকেই সরকারী উদ্যোগে শুরু হয়েছে বাঙ্গালী পূনর্বাসন।[৯৪] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হবার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি এবং অ-উপজাতি জনসংখ্যার হার ছিল ৯৭.৫% এবং ২.৫%। কিন্তু সেখানেই ১৯৫১ সালে ৯১% এবং ৯%। ১৯৬১ সালে ৮৮% এবং ১২%। বাঙ্গালী বৃদ্ধির সাথে সাথে উপজাতিদের অর্থনীতিতে চাপ পড়েছে। কৃষি জমি হচ্ছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। উপজাতীয় অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য ইংরেজ প্রশাসনে যে রক্ষা কবচ তৈরী করা হয়েছিল তা সবই বাতিল করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানী আমলে সরকার সমস্যা সমাধানে কোন নীতি গ্রহণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ শেখ মুজিব প্রশাসন

পর্বত সঙ্কুল সমস্যার মধ্যে শূণ্য হাতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে অধিকতর মনোনিবেশ করাতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আকাঙ্খা ও নানা সমস্যার প্রতি যথোচিত নজর দেয়া যে সম্ভব ছিলনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা হোক এরপরও তাদের আস্থায় এনে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৯৫] ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী দেশের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্লাটফরম গঠন করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর সদিচ্ছায় সাড়া দিয়ে ঐ অঞ্চল থেকে জনসংহতি সমিতির টিকেটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য যেই খোয়াই রোজা 'স্বেচ্ছায়' এতে যোগদান করেন। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা -কে এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলার বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগের জেলা কমিটির সেক্রেটারী পদে তিনজন সিনিয়র নেতাকে বসানো হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে নয়া সৃষ্ট বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় গভর্ণর পদে যথাক্রমে মং শু প্রু চৌধুরী ও মাং প্রু সেইন চৌধুরী অধিষ্ঠিত। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে করণীয় সম্বন্ধে সুপারিশ পেশের জন্য তৎকালীন সচিব আবুল আহসানকে প্রধান করে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়।[৯৬]

মুজিব প্রশাসনে দেখা যায় যে, পাকিস্তানী আমলে যে সমস্যাটি অর্থনৈতিক ছিল, মুজিব প্রশাসনের নীতির ফলে তা আরো ব্যাপক হয়ে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়।[৯৭] শেখ মুজিব উপজাতীয় সমস্যাটি গভীরভাবে অনুধাবন না করে সমস্যা সমাধানে তাদেরকে উপজাতীয় অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে বাঙ্গালী হবার আহবান জানান। তিনি ১৯৭৩ এর নির্বাচন পূর্ব রাঙ্গামাটির এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এ কথার পূনরাবৃত্তি করেন। ফলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরাজিত হন চাকমা প্রার্থী মানবেন্দ্র লারমার নিকট। কিন্তু তখন উপজাতীরা বঙ্গবন্ধুকে ভুল বুঝেছিলেন। তিনি কখনই তাঁদের বাঙ্গালী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। সংসদে ১৯৭৪ এর ২৩শে জানুয়ারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলাদেশ একটি এক ভাষা ও এক সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

হবে, এ প্রস্তাব পাশ হলে মানবেন্দ্র লারমা এর প্রতিবাদ জানান। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, "বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমি বাংলাদেশী, কিন্তু আমার একটি আলাদা সত্ত্বা আছে। সেখানে আমি চাকমা, বাঙ্গালী নই---"।

বঙ্গবন্ধু অনেক ভাল পদক্ষেপের ভিতর বাঙ্গালী পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি ভাল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উদ্যোগে বাঙ্গালী বসতি শুরু হলে উপজাতীয় নেতারা প্রতিবাদ জানান, শেখ মুজিব ১৯৭৩ এর ঘোষণায় এ পূনর্বাসন বন্ধ করেন।[৯৮]

আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান ও উপজাতীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ সার্বিক উন্নয়নের দিকে নজর দেন। এ লক্ষ্যে তিনি দ্রুত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেগুলির বিশেষ বিশেষ কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলঃ-

১। নতুন চাকমা রাজা ঘোষণা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের কারণে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় দেশ ত্যাগ করলে চাকমা উপজাতির রাজার পদ শুণ্য হয়। চাকমা উপজাতির ঐতিহ্যবাহী নেতার এই শূণ্য পদ পূরণপূর্বক উপজাতীয়দের মধ্যে মনোবল ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম ত্রিদিব রায়ের জ্যৈষ্ঠ পুত্র কুমার দেবাশীষ রায়কে চাকমা রাজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশেষ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য ১৯৭৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্দেশ দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যা মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ান ১৯৭৩ সালের ৬ই জুন প্রধানমন্ত্রীর সংসদ কক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধানমন্ত্রী তাকে আশ্বাস দেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। তিনি উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩টি, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ২টি, ঢাকা প্রকৌশল

Dhaka University Institutional Repository

ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি, কৃষি কলেজে ২টি এবং পলিটেকনিকে ৫টি আসন সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। [৯৯]

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী যুগ যুগ ব্যাপী অবহেলিত, বঞ্চিত এবং পশ্চাদপদ উপজাতীয় জনগণের অবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

৪। উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৈদেশিক বৃত্তি প্রদানঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অনুন্নত এবং অবহেলিত উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৩ সাল থেকে বৈদেশিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯৭৩ সালের পর থেকে প্রতিবছরই কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে বৃত্তি দিয়ে পাঠান হয়। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পর উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ধারা ব্যাহত হয়।

৫। চট্টগ্রাম ও ঢাকার উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য বাড়ী বরাদ্দঃ শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় একটি করে পরিত্যক্ত বাড়ী বরাদ্দের আদেশ দেন। চট্টগ্রামে যে বাড়ীটি বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব নিহত হবার পর আর দখল পাওয়া যায়নি। ঢাকায় যে বাড়ীটি বরাদ্দ দেয়া হয় উপজাতীয় ছাত্ররা বর্তমানে তা ভোগ দখল করছে।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত : পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে রাঙ্গামাটিকে ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ শুরু করা হবে এবং প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা কালে তিনটি পর্যায়ে এ কাজ শেষ হবে বলে বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী ১৯৭৪ সালের ১১ই আগষ্ট রাঙ্গামাটি তে ঘোষণা দেন। এতে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। তিনি আরো জানান যে, চলতি বছরই জেলার বাকী ৮টি থানার বিদ্যুতায়ন কাজ গ্রহণ করা হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটির ভাঙ্গনরোধ কাজ হাতে নেয় এবং শেষ করে।

৭। জাতীয় সংখ্যালঘু হিসাবে উপজাতীয়দের অধিকার প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের ঘোষণাঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান রাঙামাটি সফরকালে এক ভাষণ দানকালে ঘোষণা করেন যে, এজন্যই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কর্মসূচী হিসাবে তিনি নতুন বন সৃষ্টি এবং তা রক্ষণাবেক্ষনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট ঘাতক চক্রের হাতে নিহত হওয়ায় জাতির জনকের সকল ইচ্ছারই পরিসমাপ্তি ঘটে।[১০০]

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ জিয়া সরকার

শেখ মুজিব প্রশাসনের সময়ে উপজাতি সমস্যা একটা প্রকট আকার ধারন করে এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবী ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দাবীতে উন্নীত হয়। যদিও সংকুল পরিবেশে মুজিব সরকারের পর্বত প্রমাণ সমস্যা একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভবও ছিল না। মুজিব সরকারের পরে আসে জিয়াউর রহমান সরকার। জিয়া সরকার সমস্যাটির মূলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। এ সরকারের মতে সমস্যাটি অর্থনৈতিক।[১০১] অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গ্রহণ করেন। একজন সামরিক ব্যক্তি এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল-

১। ভূমিহীন উপজাতিদের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করা।

২। কৃষি উৎপাদন বাড়ানো জন্য যথোপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করা।

৩। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরী করা।

৪। জনসাধারণের উন্নতির জন্য উৎপাদনমূখী কাজকর্ম শুরু করা।

৫। স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য হেলথ কমপ্লেক্স বানানো।

৬। ছোট ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার জন্য সাহায্য প্রদান।

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।

সশস্ত্র সংগ্রামীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটি দূর করার জন্য জিয়া সরকার রাজা ত্রিদিব রায়ের মাতা বিনতা রায়কে প্রেসিডেন্ট -এর উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। বিনতা রায়ের পর অং সু প্রু চৌধুরী এবং পরে সুবিমল দেওয়ান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনজনই ছিলেন সামন্ত প্রভূভুক্ত সাধারণ শ্রেণী নন। কাজেই এ তিনজনের নিয়োগ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেনি।[১০২]

দ্বিতীয়ত: ১৯৭৮ এ চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতি পরিষদ গঠনে মাধ্যমে জিয়া সরকার উপজাতীয় প্রতিনিধিত্ব গড়তে চেয়েছিলেন। এ পরিষদের সদস্যরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং উপজাতীদের নিকট দায়িত্বশীল হবেন

Dhaka University Institutional Repository

না। সুতরাং পরিষদ তাদের আস্থা অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। শান্তিবাহিনীর বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল যা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়।

এ সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর নীতি প্রয়োগ করেছেন বাঙালী পূনর্বাসন করে। ১৯৭৯ থেকে ৮১ পর্যন্ত অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বাঙ্গালী পূনর্বাসন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। ভূমিহীন বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করানোর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বলা হয়েছিল এলাকাটি জনবিরল। ফলে ১৯৮০ 'র মধ্যে বাঙালী জনসংখ্যার আনুপাতিক হার হয় ২৭.৫। বর্তমানে ১৯৯০ 'র বাঙ্গালী হচ্ছে ৩৯.৩৮% এবং উপজাতি হচ্ছে ৬০.৬২। জেলাভিত্তিক সরকার আনুপাতিক হার হচ্ছে :-

উপজাতি বাঙ্গালী	খাগড়াছড়ি	রাঙ্গামাটি	বান্দরবান
উপজাতি	৬৩.৬৯%	৫৯.৪৮%	৫৭.১৮%
বাঙ্গালী	৩৬.৩০%	৪০.৪৯%	৪২.৭৭%

বাঙ্গালী পুনর্বাসনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আবাদযোগ্য ভূমির কথা চিন্তা করা উচিত ছিল সরকারের। ঐ জেলায় মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে তেত্রিশ লাখ একর। এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ একর অর্থাৎ ৮৯% বনাঞ্চল। বাকী সাড়ে তিন লাখ একরের মধ্যে ফসলীকৃত জমির পরিমাণ এক লাখ বিশ হাজার অর্থাৎ ৪% ভাগ। কাপ্তাই বাঁধ সৃষ্টি হবার ফলে ফসলী জমির ৪০% ভাগ কমে গেছে।

সুতরাং জমির পরিমাণও কমেছে। এসব চিন্তা না করেই বাঙ্গালী পুনর্বাসন করা হয়েছে। একটি অর্থনৈতিক অনগ্রসর সমাজের অধিবাসীদের জীবিকা অন্বেষণের জন্য অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে বাঙ্গালীদের সাথে। সুতরাং সমস্যা তরল না হয়ে ঘনীভূত হয়েছে।[১০৩]

১৯৮০-তে জিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন করার জন্য আর একটি পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করেছিল। উপদ্রুত এলাকা বিল নামে একটি বিল সংসদে আনা হয় আইনে পরিণত করার জন্য। এ বিলের বৈশিষ্ট্য হল যে, সরকার কর্তৃক যে অঞ্চলগুলো উপদ্রুত এলাকা বলে চিহ্নিত হবে ঐসমস্ত এলাকায় একজন পুলিশ সাব

Dhaka University Institutional Repository

-ইন্সপেক্টরও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা গুলি করতে পারবে। বিলটি জনসাধারণ এবং বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রচন্ড বিরোধীতার ফলে পাশ হতে পারেনি। বিলটি সম্পর্কে বিরোধী সদস্যরা বলেছিলেন যে, এটি আইনে পরিণত হলে কর্তৃপক্ষ দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৮১'র প্রথম দিকে জেনারেল মঞ্জুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং জেনারেল মঞ্জু উভয়ের অকাল মৃত্যুর ফলে এ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আরেকটি পদক্ষেপ হলো সন্তু লারমার মুক্তি। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে (সন্তু লারমা) মুক্তি দেওয়ার জন্য ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ অনেকদিন থেকেই দাবী জানিয়ে আসছিলেন। ট্রাইবেল কনভেনশনের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার জেলখানায় সন্তু লারমার সাথে আলোচনাক্রমে সন্তু লারমা, অনিমা চাকমা, বিভূতি চাকমা এবং চাবাই মগকে মুক্তি দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে জিয়া সরকারের অনুসৃত নীতি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে কোনরূপ অবদান রাখার পরিবর্তে বরং তা পরিস্থিতির জটিল ও সংকটময় করে তোলে। সমস্যার সামরিক সমাধানের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করার কারণে জিয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

জিয়াউর রহমান কর্তৃক 'বাঙালীর' স্থলে জাতীয়তাবাদের 'বাংলাদেশী' নতুন সংস্করণকে অনেক উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা অর্জন হিসেবে দেখার চেষ্টা করলেও, প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে কোন সংশ্রব ছিল না। জাতীয়তাবাদের বাংলা 'বাংলাদেশী' ধারনার মধ্যে ধর্মীয় উপাদান টেনে এনে নতুন রাজনৈতিক বলয় সৃষ্টিই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ প্রেসিডেন্ট সাত্তারের শাসনামল

১৯৮২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ১১টায় রাষ্ট্রপতির উপজাতীয় বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা জনাব সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ও বাঙ্গালীদের একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এই জেলার সমস্যা সমাধানের পন্থা নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে মত বিনিময় করেন। তবে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ফর্মূলা ঐ বৈঠকে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যতে এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। রাঙামাটি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব কাজী নজরুল ইসলাম ঐ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ এরশাদ প্রশাসন

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট সাত্তার বাংলাদেশের প্রশাসনের শীর্ষে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। তারপর এরশাদ সরকারের প্রশাসন শুরু হয়। এ প্রশাসনই সর্বপ্রথম স্বীকার করে যে, সমস্যাটি রাজনৈতিক।

সমস্যা সমাধানে এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জিয়া সরকারের আমলে গঠন করা চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পূন: চালু করেন। ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করা হয়েছে সর্বমোট ৩১৫৩.৫৬ লাখ টাকা। শুধু তাই নয় এরশাদ প্রশাসন ১৯৮৪ তে এই এলাকার জন্য একটি বিশেষ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনায় মোট ১৯টি প্রকল্প ছিল। এ প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৯৯০ পর্যন্ত ২৬,২১৩.০০ লাখ টাকা। মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে মহিলা পরিচালিত তাঁত দ্বারা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির আরও একটি পদক্ষেপ হচ্ছে রাবার চাষ প্রকল্প। একটি প্রকল্পের দ্বারা দু'হাজারের ওপর উপজাতি পরিবারের পূনর্বাসন হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এরশাদ সরকার যথেষ্ঠ নজর দিয়েছিলেন।[১০৫] নিচের সারনী থেকে এটা প্রতীয়মান হবে:-

শিক্ষা

	১৯৪৭	১৯৪৭-১৯৮২	১৯৮৩-১৯৮৯
১। কলেজ	--	৫টি	৯টি (সরকারী ৩টি)
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১টি	৪০টি	৬২টি
৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০টি	৮৮০টি	৯৩৮টি
৪। ছাত্রদের আবাসিক হল	--	--	উপজাতীয় ছাত্রদের আবাসিক হল -৯টি আবাসিক হল স্কুলসহ ২টি
৫। শিক্ষার হার	২-৩%	--	২০%
৬। কারিগরী শিক্ষা	নেই	রাঙ্গামাটি-১টি খাগড়াছড়ি-১টি	রাঙ্গামাটি ১টি

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের পিছিয়ে থাকার কারণ ভাষা। বাঙলা ও উপজাতীয় ভাষা এক নয়। উপজাতি শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এই সরকারের আমলে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেকটি উপজাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ফলে সবাই নিজ নিজ ভাষা চর্চার সুযোগ পাচ্ছে। এ ধরনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ড রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানকে ত্বরান্বিত এবং অর্থবহ করে তোলে। কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি জনসাধারণের মনে প্রশাসন সম্পর্কে আস্থা আনতে সাহায্য করে।

এ ব্যতীত এরশাদ প্রশাসনে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধনের জন্য প্রথমে সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করেন। এ সরকারের আমলে ৪ বার সাধারণ ক্ষমা করা হয়। ৩রা অক্টোবর '৮৩ থেকে ২৫ এপ্রিল '৮৪, ২৬শে এপ্রিল থেকে ২৬শে এপ্রিল '৮৫, ২২শে এপ্রিল '৮৯ থেকে ২২শে জুন '৮৯, ২৩শে আগস্ট থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর '৮৯। এ ৪বার সাধারণ ক্ষমার অধীনে ২২৯৪ জন শান্তি বাহিনী সদস্য আত্মসমর্পন করেন।

একথা সত্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিবেশে উপজাতি পরিবারই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা ভারতের শরনার্থী শিবিরে চলে গিয়েছিল তাদের কিছু অংশ ফিরে এসেছে সাধারণ ক্ষমার আওতায় এবং জেলা পরিষদ নির্বাচনের পর। ১৯৮৭ থেকে শুরু করে ১৯৯০ পর্যন্ত উপজাতি ৮৪৩৮টি পরিবারের ৩০,৩৯৯ জন সদস্য ফিরে এসেছে নিজেদের বাসভূমিতে। ভারত থেকে ফিরে আসা শরনার্থীদের সরকার পূনর্বাসিত করছে বড়গ্রাম বা গুচ্ছগ্রামে। চারন জীবন যাপনে অভ্যস্ত উপজাতিরা বর্তমানে নিরাপত্তার জন্য একত্রে এক একটি গ্রামে বাস করছে। এ গ্রামগুলোকে গুচ্ছগ্রাম বা বড়গ্রাম বলা হয়। উপজাতিরা বলে বড় গ্রাম। বাঙ্গালীদের নিরাপত্তার জন্যও যে সকল উপজাতি ভারতে যায়নি তারও নিরাপত্তার জন্য গুচ্ছ গ্রামে বাস করতে আগ্রহী। প্রতিটি গুচ্ছগ্রাম ১৫০ থেকে ৪০০ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রারম্ভে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক পরিবারকে ২১ কিলো করে চাল দেয়া হতো। কিন্তু এতো চাল পরবর্তীতে দেয়া সম্ভব হয়নি। কোন কোন গুচ্ছগ্রামের অধিবাসীদের আবার ৫ একর জমি, এক থেকে দেড় হাজার টাকা দেয়া হয়েছে পূনর্বাসনের জন্য। গুচ্ছগ্রাম পরিচালনা কমিটির অধীনে নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেমন :-

Dhaka University Institutional Repository

১। স্থানান্তরিত ও বাস্তুহীনদের বাসগৃহ নির্মাণ।

২। ভূমিহীনদের ভূমি দান।

৩। কৃষি উন্নয়ন।

৪। কুটির শিল্প গড়ে তোলা।

৫। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৬। সমবায় সমিতির মাধ্যমে রিকশা ক্রয় ও চালু ইত্যাদি।

উপজাতীয়গণের যদি এ ধরনের অর্থনৈতিক কাজ কর্ম প্রশাসন চালু রাখতে সক্ষম হয়। তবে যুগযুগ ধরে বংশগত জুম চাষাবাদ দিয়ে এরা আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে বাধ্য হবে অথবা আগ্রহী হবে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেলে যে কোন জনপদেই শান্তি নেমে আসে তাড়াতাড়ি। উপজাতি এবং অ-উপজাতি দ্বন্দ্বেরও অবসান হতে বাধ্য যদি অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা সরকার পুরোদমে দিতে পারেন উপজাতিদের।

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমেই দরকার ছিল বাঙ্গালী পূনর্বাসন বন্ধ করা। শান্তিবাহিনীর অনেক দাবীর মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। এরশাদ আমলে বাঙ্গালী ১৯৮৯ থেকেই বন্ধ করা হয়েছে। তবে কোন কোন অঞ্চলে ১৯৮৫ থেকেই বাঙালী বসতি বন্ধ আছে।[১০৬]

রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল জনসংহতি সমিতির ছয়বার আলোচনা সভায় মিলিত হওয়া। এর মাঝে ৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল পানছড়ি উপজেলার পুজগাংমুল কমিউনিটি সেন্টারে এবং ৬ষ্ঠ বৈঠক হয়েছিল খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সার্কিট হাউজে। দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের ৫ দফা দাবী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পেশ করে। সমিতির এই ৫ দফা দাবী মেনে নেয়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ৪র্থ বৈঠকে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নিকট ৯ দফা প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে :-

১। সংবিধানের ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলাকে বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

২। সংবিধানের ৯ ও ২৮ ধারা আলোকে চট্টগ্রামের তিন জেলায় (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক পৃথক জেলা পরিষদ গঠন।

৩। বিষয় বিভক্তি স্থিরকরণ।

৪। সংবিধানের ৬৫ ধারার আলোকে জেলা পরিষদসমূহকে মূল আইনের অধীনে নির্দিষ্ট বিষয়ে উপ-আইন, আদেশ-বিধি প্রণয়ন, জারী এবং কার্যকরী করার ক্ষমতা অর্পন।

৫। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন, জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব এলাকার জন্য আপত্তিকর বিবেচিত হলে সংসদে পূনর্বিবেচনার দাবী সরকারকে অবহিত করার জন্য আইনগত ক্ষমতা অর্পন।

৬। জেলা ও উপজাতীয় সার্কেলের এলাকা একত্রীকরনার্থে সীমানা পূন:নির্ধারণ।

৭। জেলা প্রধান এবং উপজাতীয় প্রধানের সমন্বিত অবস্থান নির্ণয়।

৮। প্রতি সার্কেলে পুলিশ বাহিনী গঠন।

৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের যথাযথ সংশোধন, বাস্তবায়ন অথবা বাতিলকরন।

সরকার ৯ দফার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানে ইচ্ছুক। কিন্তু জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী প্রত্যাহারে রাজী নন। এ ধরনের উত্তপ্ত পরিবেশে ও ৬ষ্ঠ বৈঠকের আলোচনা ১৯৮৮'র ডিসেম্বরের ১৪-১৫ তারিখে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৮৯'র মার্চে সরকার পারস্পরিক আলোচনা সম্পূর্ণ শেষ না করেই ৯ দফার ভিত্তিতে সংসদে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বা জেলা পরিষদ আইন পাস করে (১৯/২০/২১ নং আইন) এবং এ আইনের মাধ্যমে ঐ বছরই পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি জেলার-রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য জেলা পরিষদের কার্যাবলীতে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এ আইনের অধীনে তিনটি পার্বত্য জেলা শাসিত হবে জেলা পরিষদের মাধ্যমে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ৩০ জন সদস্য থাকবে। প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হবে উপজাতীয় এবং বাদ বাকী সদস্য হবে অ-উপজাতীয়। চেয়ারম্যান হবেন একজন উপজাতীয়। চেয়ারম্যানদের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী এবং নির্বাচিত সদস্যদের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী এবং নির্বাচিত সদস্যদের পদমর্যাদা উপজেলা চেয়ারম্যানদের সমান। উপজেলা সদস্যপদ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন তিনটি জেলায় বসবাসকারী প্রতিটি উপজাতির প্রতিনিধি নিশ্চিত হয়। রাঙামাটির চাকমা প্রধান, খাগড়াছড়ির মঙ প্রধান এবং বান্দরবানের বোমাঙ প্রধান নিজ নিজ জেলায় জেলা পরিষদ সভায় যোগ দিতে পারেন এবং নিজস্ব মতামত আলোচনায় ব্যক্ত করতে পারবেন।[১০৭]

এছাড়াও ২১টি বিষয়ের উপর প্রশাসনিক দায়িত্বভার এ জেলা পরিষদগুলো পেয়েছে। বিষয়গুলো হলো :-

১। আইন ও শৃংখলা

২। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয়, পর্যালোচনা, হিসাবরক্ষণ।

৩। শিক্ষা

৪। স্বাস্থ্য

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন

৬। কৃষি ও বন

৭। পশুপালন

৮। মৎস সম্পদ

৯। সমবায়

১০। শিল্প ও বাণিজ্য

১১। সমাজ কল্যাণ

১২। সংস্কৃতি

১৩। বেসরকারী স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

১৪। বেসরকারী খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলো এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক আরোপিত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং

২১। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থিক উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাস্তবে ২১টি বিষয়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদকে মাত্র তিনটি বিষয়ের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ৩টি বিষয় হলো-প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার উন্নয়ন।

এরশাদ সরকার আরো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, এ এলাকার শান্তি নিশ্চিত করার জন্য। "বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়" নামে একটি নতুন দফতর খোলা হয়েছিল। যে দফতর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলী সমাধান এবং উন্নয়ন কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলা হয়েছিল। তবে জনসংহতি শান্তিবাহিনীর দৃষ্টিতে ৩টি উপজাতিদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির একটি কৌশল।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ খালেদা জিয়া সরকারের সময়কাল

এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ সরকারের পতনের পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারী '৯১ এর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রচেষ্টায় কোন হেরফের না হয়ে বরং তা নতুন মাত্রায় অব্যাহত থাকে। ১৯৯২ সালের ৯ জুলাই তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অব:) অলি আহমদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট সর্বদলীয় সংসদ সদস্যদের একটি কমিটি গঠিত হয় (যদিও এটি সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটি ছিল না)। ভারতে আশ্রয় নেয়া উপজাতি শরনার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক উদ্যোগে খালেদা সরকারের পক্ষে ভারতের সংগে ৯মে ১৯৯৩ একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হয়।[১০৮] চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৭৯টি পরিবারভুক্ত শরনার্থীদের প্রথম ব্যাচ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

এ সংকট সমাধানের জন্য খালেদা জিয়া সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির কয়েক দফা বৈঠক চলে। আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী নিরাপত্তা বহিনী ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে অস্ত্র বিরতির আয়োজন করা হয় এবং এর মেয়াদ পর্যায়ক্রমে নবায়ন হতে থাকে। খালেদার শাসনকালে শান্তি প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিটি সর্বমোট ১৩ বার ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনসহ ভারত সফর করে। শান্তি আলোচনায় জনসংহতি সমিতি পূর্বের অবস্থান থেকে দৃশ্যত: সরে এসে 'প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের' স্থলে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের' দাবিসহ সংশোধিত দাবিনামা উথাপন করে। নি:সন্দেহে জনসংহতি সমিতির বর্তমান এ অবস্থান শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে একটি অগ্রগতি।[১০৯] ১৯৯৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারের সংগে ৫ম দফা বৈঠকের প্রাক্কালে জনসংহতি সমিতির সংশোধিত এ দাবিনামা সম্বন্ধে সরকারি অবস্থান লিখিতভাবে ব্যক্ত হয়, যা ছিল এরূপ:-

"The CHT has already been recognized a special area through the three CHT local Government council Acts and given separate administrative system. Almost all subjects mentioned have been transferred.

Dhaka University Institutional Repository

the demand for a separate police force have been met through the local Government Council Acts.

Land rights and restrictions on the purchase or land and settlement by outsiders are included in the local Government Council Acts.

the tribal communites have already been recognized in the local Government council Acts.

With the normalization of the law and order situation in the area, all temporary camps, except army camps required for security reasons, will be with drawn in phases. But the cantoments and their activities will continue.

No reservation of parliament seats is needed as the sitting MPs already belong to the Jumma people. Quota for the Defence service cannot be given.

there is no logic to, nor a historic basis for, changing the name of CHT the Jumma refugees and evacuces will be rehabilited .

Measures with regard to the dismanthing of eluster villages have been taken.

জনসংহতি সমিতির দাবীনামার ব্যাপারে স্পষ্টত: লক্ষ্যণীয় যে, খালেদা জিয়ার সরকারের অবস্থান ছিল বহুলাংশে নমনীয় বা সম্মতিসূচক। বিশেষ করে নিরাপত্তাজনিত কারণে আবশ্যক সেনাবাহিনীর অবস্থিতি ব্যতীত সকল অস্থায়ী সেনাছাউনী এক পর্যায়ে পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে বি.এন.পি সরকারের সম্মতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ ক্ষমতার বাইরে বি.এন.পি নেত্রী পূর্বের অবস্থানের বিরোধীতা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা ও প্রস্তাব

বাংলাদেশ আমলে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করে এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকার তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরশাদ সরকার প্রথম উপলব্ধি করেন যে, সমস্যাটি রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে সমস্যাটি সমাধানের জন্যও অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়। আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৬টি। এগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

৪.৭ এরশাদ আমল

১ম বৈঠক :	২১শে অক্টোবর ১৯৮৫ এরশাদ সরকার ও Pejss এর মধ্যে	Punchgang
২য় বৈঠক :	১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৭	,,
৩য় বৈঠক :	২৪-২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৭	,,
৪র্থ বৈঠক :	১৭-১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮	,,
৫ম বৈঠক :	১৯শে জুন ১৯৮৮	খাগড়াছড়ি
৬ষ্ঠ বৈঠক :	১৪-১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৮	সার্কিট হাউজ

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ খালেদা জিয়া প্রশাসন

খালেদা জিয়া সরকারের আমলে যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদে নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সাথে Pejss এর নিম্মবর্ণিত বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

১ম বৈঠক : ৫ই নভেম্বর ১৯৯২ (খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ)

২য় বৈঠক : ২২শে ডিসেম্বর ১৯৯২ ,,

৩য় বৈঠক : ২২শে মে ১৯৯৩ ,,

৪র্থ বৈঠক : ১৪ই জুলাই ১৯৯৩ ,,

৫ম বৈঠক : ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ,,

৬ষ্ঠ বৈঠক : ৫ই মে ১৯৯৪ ,,

১৯৯৪ সালের ৪ জুন বিএনপি সরকার রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠন করে এবং ঐদিনই সাব কমিটির সাথে Pejss বৈঠক হয় দুদুকছড়িতে। পরবর্তীতে ঐ কমিটির সাথে আরো কয়েকটি বৈঠক হয়। এগুলো হলো :

১ম বৈঠক : ৪ঠা জুন ১৯৯৪ (দুদুকছড়ি)

২য় বৈঠক : ১০ই জুলাই ১৯৯৪ (পানছড়ি)

৩য় বৈঠক : ২৮শে আগস্ট ১৯৯৪ (পানছড়ি)

৪র্থ বৈঠক : ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ (পানছড়ি)

৫ম বৈঠক : ১২ই জুলাই ১৯৯৫ (পানছড়ি)

৬ষ্ঠ বৈঠক : ২৭শে অক্টোবর ১৯৯৫ (পানছড়ি)

সর্বশেষ বিএনপি সরকার ও Pejss এর ১৩তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দুদকছড়িতে এবং এতে কোন ফলাফল হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ শেখ হাসিনার সরকারের আমল

আওয়ামীলীগের সরকারের জাতীয় কমিটির সাথে Pejss এর নিম্নবর্ণিত বৈঠক হয়। অবশেষে কাঙ্খিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১ম বৈঠক : ২১-২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ)

২য় বৈঠক : ২৫-২৬ জানুয়ারী ১৯৯৭ (মেঘনা গেস্ট হাউজ)

৩য় বৈঠক : ১২-১৩ই মার্চ ১৯৯৭ (মেঘনা গেস্ট হাউজ)

৪র্থ বৈঠক : ১১-১৪ই মে ১৯৯৭ (মেঘনা গেস্ট হাউজ)

৫ম বৈঠক : ১৪-১৮ই জুলাই ১৯৯৭ (মেঘনা গেস্ট হাউজ)

৭ম বৈঠক : নভেম্বর ২৬ থেকে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭ মেঘনা গেস্ট হাউজ ঢাকা।

অবশেষে ২রা ডিসেম্বর '৯৭ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০-২৫ মিনিটে বহু প্রতীক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি শেখ হাসিনা সরকারের প্রচেষ্টায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। যদিও চুক্তিটির কোথাও শান্তি কথাটির উল্লেখ ছিল না। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে জাতীয় কমিটির প্রধান আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং জনসংহতি কমিটির পক্ষে এর প্রধান জ্যেতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানকালে শেখ হাসিনাসহ মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, জাতীয় কমিটি ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, ঢাকার মেয়র, চাকমা প্রজাসহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ দুই যুগের বিদ্রোহ,সংঘাত, রক্তক্ষয় আর হিংসার অবসান ঘটিয়ে দেশের পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা দক্ষিণপূর্বের পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির দুই প্রধান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯৬-জুলাই ২০০১)

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন আওয়ামীলীগ সরকারের দ্বিতীয় বারের মত ক্ষমতা লাভ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ক্ষমতারোহন পার্বত্যবাসীদের আশান্বিত করে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকায় আওয়ামীলীগ সরকারের কাছ থেকে দেশবাসী কার্যকর ভূমিকা আশা করে। প্রথমদিকে অবশ্য কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার লাল্যাঘোনার হিল উইমেন ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণ পাহাড়ী জনগণকে বিস্মিত করে।[১১০] পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় শান্তিবাহিনী সার্বিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২৮ জন বাঙ্গালী কাঠুরিয়াকে হত্যা করে। পরবর্তীতে ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জন সংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফা অস্ত্র বিরতি ঘোষণা দিলে আওয়ামী লীগ সরকার উক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানায় এবং মন্ত্রী পরিষদ সভার আলোচ্যসূচীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিষয় না থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। কমিটির কাঠামো নিম্নরূপঃ

১। আবুল হাসনাত অব্দুল্লাহ চীফ হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ. কনভেনার।

২। এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সদস্য।

৩। কল্পনারঞ্জন চাকমা এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৪। প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন, এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৫। আতাউর রহমান খান কায়সার, শিল্পপতি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৬। দীপঙ্কর তালুকদার, এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৭। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এমপি, বিএনপি সদস্য (অনুপস্থিত)

৮। সৈয়দ অহিদুল আলম, এমপি, বিএনপি সদস্য (অনুপস্থিত)

৯। এডভোকেট ফজলে রাব্বি, এমপি, জাপা সদস্য।

১০। এ,কে, খন্দকার সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান, প্রাক্তন কনভেনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

১১। আলী হায়দার খান, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।

১২। এস, এস, চাকমা, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব।

যোগাযোগ কমিটি

১। হংসধ্বজ চাকমা, কনভেনার।

২। নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, সদস্য।

৩। কৈ শৈ অং চাকমা, সদস্য।

৪। মথুরা লাল চাকমা, সদস্য।

৫। মোঃ সাকি, সদস্য।

৬। বিশ্বজিৎ চাকমা, সদস্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে

১। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)

২। গৌতম কুমার চাকমা

৩। রুপায়ন দেওয়ান

৪। সুধা সিন্ধু খিসা

৫। রক্ত উৎপল ত্রিপুরা

এর পর পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় বৈঠকের পর বৈঠক।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা লাভ, ভারতে উদারপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং উভয় সরকারের ঘনিষ্ট সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভারতে গৌড়ার সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের সংগে সম্পর্কোন্নয়নে উৎসাহী ছিলেন। গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সে আকাঙ্খারই সফল বাস্তবায়ন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তেমনি শান্তিবাহিনী সমস্যা সমাধানেও ভারতের ভূমিকা লুকানো নেই। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশকে ভারতের বিরুদ্ধে কাউকে ব্যবহার করতে দিবেন না। সে অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থাও নেয়। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বিদ্রোহীরা সরে পড়ে এবং এদেশের মধ্য দিয়ে তাদের অস্ত্র বা রসদ সরবরাহের লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।[১১১] ভারত সরকার মনে করে পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আই.এস.আই বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতের বিদ্রোহীদের সহায়তা দিয়ে এসেছে। ভারতীয় বিদ্রোহীদের ব্যাপারে বাংলাদেশের মনোভাব প্রকাশিত হবার পর শান্তিবাহিনীর ক্ষেত্রে ভারতীয় শুভেচ্ছা দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। শান্তিবাহিনীকে আর সহায়তা দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে ভারত সরকার বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছে। দেব গৌড়ার পর ইন্দর কুমার গুজরালের সরকারও এ ব্যাপারে আরও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেন। ভারতের ত্রিপুরা থেকে শান্তি বাহিনীকে ঘাঁটি উঠাতে হয়েছে। জনসংহতি নেতারা ভারতীয় পক্ষ থেকে চাপের মধ্যে পড়েছেন। তাদের ট্রেনিং দেয়া, খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব কারণে শান্তি বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সংগে দ্রুত সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।[১১২]

অন্যদিকে দেখা যায় নানা কারণেই শান্তিবাহিনীর মধ্যেও এক ধরনের যুদ্ধ ক্লান্তি ভর করছে। গত ২৫ বছরে তাদের সামরিক সংঘাতের ইতিহাসে এমন কোন বড় সাফল্য নেই যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর সামরিক সংঘাত এবং বাঙ্গালী উপজাতি দাঙ্গায় গড়ে আড়াই দশকে ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। কিন্তু শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন

Dhaka University Institutional Repository

এলাকাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। অন্যদিকে সংঘাত ও যুদ্ধাবস্থার কারণে পাহাড়ে সাধারণ মানুষ এ সময়কালে কখনোই শান্তি পায়নি।[১১৩]

তাছাড়া গড়ে সাড়ে চার বছর ধরে যুদ্ধ বিরতি চলার পর শান্তি বাহিনীর পক্ষেও আবার যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার মন মানসিকতা নেই। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের নতুন রিক্রুটমেন্টও এক রকম বন্ধ। সাধারণ পাহাড়ী জনগণও শান্তি চান, চান স্বস্তি নিয়ে বাঁচতে। এ পরিস্থিতি উপেক্ষা করা শান্তি বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

তাই গত ২রা ডিসেম্বর তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ নিরসনে এই চুক্তি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত।[১১৪]

এর পরে চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী '৯৮ খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তার নিজের অস্ত্রটি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। প্রথম ব্যাচে শান্তি বাহিনীর মোট ৭৩৯ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পন করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২য় ব্যাচে শান্তিবাহিনীর ৫৪৩ জন সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম এর উপস্থিতিতে এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী তৃতীয় ব্যাচে শান্তি বাহিনীর ৪৩৩ জন সদস্য চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর কাছে তাদের অস্ত্র জমা দেয়। বাকীরা ৪র্থ ব্যাচে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পন করে। দেশী-বিদেশী অতিথিবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী বর্গ, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই শান্তির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বিবরণ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত ৪ খন্ড (ক.খ.গ.ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন:

ক) সাধারণ

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ /পার্বত্য জেলা পরিষদ।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ (ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে বলে স্থিরিকৃত করেছেন।

৩। এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করবার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে:

ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য : আহবায়ক

খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান : সদস্য

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি : সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হতে সম্পাদিত ও সই করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হবার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ (খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ :

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নেবর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেনঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত 'উপজাতি' শব্দটি বলবৎ থাকবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করে তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হবে।

৩। 'অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' বলতে যিনি উপজাতীয় নন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করে তাকে বুঝাবে।

৪। (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন থাকবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'ডেপুটি কমিশনার' এবং 'ডেপুটি কমিশনারের' শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে 'সার্কেল চীফ' এবং 'সার্কেল চীফের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ৪ নম্বর ধারার নিম্নোক্ত উপধারা সংযোজন করা হবে। কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন। ইহা সংশোধন করে "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" এর পরিবর্তে 'হাইকোর্ট' ডিভিশনের কোন 'বিচারপতি' কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন -অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার ৪র্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে 'নির্বাচনবিধি অনুসারে, শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ বৎসর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূণ্য হলে বা তার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে: আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন (২) তার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয় (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিক ভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করে থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

Dhaka University Institutional Repository

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপধারায় 'নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ' শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলে বিধান থাকবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারার বর্ণিত 'খাগড়াছড়ি মং চীফ' এর পরিবর্তে মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারা উপধারা (২) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবে "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে"। তবে শর্ত থাকে যে উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে।

(গ) ৩২ নম্বর ধারা উপধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাদের সরকার অন্যত্র বদলী সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ ধারার চতুর্থত এর মূল আইন বলবৎ থাকবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারা (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখিত হবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারা উপধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপধারা (৪) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হবেঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থবৎসরের জন্য প্রয়োজন হলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারার নিম্নোক্ত উপধারা সংযোজন করা হবেঃ পরিষদের সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগ / প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকার' শব্দটির পরিবর্তে 'পরিষদ' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা

Dhaka University Institutional Repository

অনুশাসন করতে পারবেন। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করে থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ কর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপধারায় "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হলে" শব্দগুলি বাতিল করে তদ্‌পরিবর্তে 'এই আইন' শব্দটি পূর্বে 'পরিষদ বাতিল হলে ৯০ দিনের মধ্যে' শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকারের' শব্দটি পরিবর্তে 'মন্ত্রণালয়ের' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

২৪। (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন করা হবে: আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাতত বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করে তদ্‌পরিবর্তে 'যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারাটি প্রণয়ন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভু-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) -দের কার্যাদি ও তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাষা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হবে: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পূনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে।

৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করতে পারবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানে কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি ভিন্ন মত পোষণ করে তাহলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে।

৩১। (খ) ৬৯ ধারার উপধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত 'পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন' এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে, ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবে: পার্বত্য জেলার প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

৩৩। (ক) প্রথম তফসীলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর শৃঙ্খলা শব্দটির পরে 'তত্ত্বাবধান' শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হবে:

Dhaka University Institutional Repository

(১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসীলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

(খ) পুলিশ (স্থানীয়)

(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার

(ঘ) যুব কল্যাণ

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

(চ) স্থানীয় পর্যটন

(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

(জ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদীনালা খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা।

(ঝ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ

(ঞ) মহাজনী কারবার

(ট) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিল বিবৃত পরিষদ কর্তৃক অরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর

(গ) ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর

(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর

(ঙ) সামাজিক বিচারের উপর ফিস

(চ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ

(ছ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্রাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ।

(ঞ) ব্যবসার উপর কর

(ট) লটারীর উপর কর

(ঠ) মৎস ধরার উপর কর।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হবে:

চেয়ারম্যান	:	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	:	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	:	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	:	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	:	১ জন

400422

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে ৩ জন মার্মা উপজাতি হতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হতে, ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে।

Dhaka University Institutional Repository

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হতে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ১ জন নির্বাচিত হবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকর থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগতা অনুরূপ হবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ বৎসর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় পদ্ধতির অনুরূপ হবে।

৭। পরিষদের সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮। (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যান পদ শূন্য হয় তাহলে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষরেদ সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

(খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহার উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।

(খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এন.জি.ও.দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করতে পারবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হতে পরিষদের তহবিল গঠন হবে:

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ।

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ (ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলীঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নিম্নেবর্ণিত অবস্থানে পৌঁছেছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হয়েছেনঃ

১। ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরনার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারও উপজাতীয় শরনার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ই মার্চ ১৯৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ' ৯৭ ইং হতে উপজাতীয় শরনার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরনার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিকরতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহলে সেইক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। জায়গা জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরনার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা জমি ও পাহাড় অবৈধভবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এ কমিশনের থাকবে। এই কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রীজল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবেঃ

(ক) অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি

(খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট)

(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি

(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার

(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)

৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরনার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অস্থায়ী ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকসংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন। সরকার এ অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান : চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিকসংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার বৃত্তি প্রদান করবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র্যতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।

১৩। সরকার জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতি সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। নির্ধারিত তারিখ যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করবেন। যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে।

(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে।

(খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতিকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকলে তাকেও মুক্তি দেয়া হবে।

(গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন এমন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না।

(ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

(চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য হবে।

১৭। (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আনার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনাবাহিনী (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনের সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গাজমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকলস্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত নিয়োগ করা যাবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করবার জন্য নিম্নবর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী

(২) চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ

(৩) চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(৪) চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

(৫) চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

(৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি।

(৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি।

(৮) সাংসদ, বান্দরবান।

(৯) চাকমা রাজা

(১০) বোমাং রাজা

(১১) মং রাজা

১২। তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী অধিবাসীদের তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ন ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।[১১৬]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিবাসীদের পক্ষে
জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

P= ১০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিবৃত হলো :

৬.১ (১) ক্ষমতায়নে পরিবর্তন ঃ

শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নে যে পরিবর্তন আনা হয় তা নিম্নে আলোচিত হলোঃ- **(ক) আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামের ও পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ" গঠন করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২২ জন। চেয়ারম্যান যিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্নসহ মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত চাকমা উপজাতি হবে, ৩ জন লারমা, ২ জন ত্রিপুরা, ২ জন মুরং ও তংচঙ্গা উপজাতি এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক ও খিয়াং উপজাতির সদস্য। এই পরিষদের মেয়াদ ৫ বৎসর এই পরিষদের ৩ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে ২ জন উপজাতীয় একজন বাঙ্গালী। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ পরিষদে উপজাতীয়দের কর্তৃক স্থাপিত হলো বিশেষ করে চাকমাদের কর্তৃত্ব। সিভিল প্রশাসন কর্তৃত্ব করতো এবং এটা সরকার থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। ফলে স্থানীয় পরিষদে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলো। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব পেল। এর ফলে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়ে গেল এবং এক অংশ আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত হল। এতে উপজাতীয় অঞ্চলে ক্ষমতায়নে পরিবর্তন হল।[১১৭]

আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতাবলী এবং উপজাতীয়দের সুবিধা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

৬.২ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ও সুবিধা ঃ এই চুক্তির ফলে স্থানীয় প্রশাসনে নিয়োগ, প্রশাসনে কর্তৃত্ব এবং পরিচালন ক্ষমতা লাভ করে উপজাতীয়রা। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী, আধা-সরকারী পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসিদের নিয়োগ করা হবে। যার ফলে উপজাতীয়রা চাকুরী পেয়ে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হতে সহায়ক হবে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে কর্মসংস্থান নিয়ে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতামত ঃ

উপজাতি	হ্যাঁ বোধক	না বোধক	অপরিবর্তিত
চাকমা	৬৩%	২৭%	১০%
মারমা	৫৬%	২৪%	২০%
ত্রিপুরা	৭১%	২২%	৭%
অন্যান্য	৫২%	২৫%	২৩%

৬.৩ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও সুবিধা ঃ উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করে। তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে, এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন বা সুপারিশমালা পেশ করতে পারে। এর ফলে আইনসংক্রান্ত বিষয়ে উপজাতীয়দের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

৬.৪ করারোপ ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ এ চুক্তির ফলে উপজাতীয়রা পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন , পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, করারোপ ক্ষমতা এক কথায় যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা পেল।

৬.৫ ভূমি কমিশন গঠন ও এর ক্ষমতা সুবিধা ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠিত হবে। কমিশন (ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি (খ) সার্কেল চীফ (গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার / অতিরিক্ত কমিশনার (ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট) সদস্যদের নিয়ে তিন বছর

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদে গঠিত হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে এর মেয়াদ বাড়ানো যাবে। এ কমিশন গঠিত হবার ফলে উপজাতীয়রা যে সুযোগ পেল বা লাভবান হলো তা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(ক) সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন। এর ফলে উপজাতীয়দের ন্যূনতম বাসস্থানের অধিকার রক্ষিত হলো।

(খ) যত দ্রুত সম্ভব ভূমি জরিপ শুরু করে যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

(গ) যে সব উপজাতীয়দের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরে প্রকল্প গ্রহণ করে নাই সে সব বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। এতে উপজাতীয়রা লাভবান হবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। জমির মূল মালিকদের। ফলে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

(ঙ) পার্বত্য এলাকার বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি জেলা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া ইজারা, বন্দোবস্ত দেয়া, কেনা-বেচা, ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। একই সংগে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও আওতাধীন কোন প্রকার জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সম্মতিছাড়া অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর করতে পারবে না সরকার। এর ফলে উপজাতীয়দের এতদ্‌সংক্রান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

(চ) বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত কোন বাঙ্গালিকে পার্বত্য এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হবে না। তবে নতুন করে কোন বাঙ্গালি অভিবাসন হবে না। ফলে উপজাতীয়দের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সব রকম চাপ থেকে মুক্তি পাবে।[১১৮]

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ কোটা ও বৃত্তি সংক্রান্ত সুবিধা ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন এবং সরকার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিকসংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। এর ফলে উপজাতীয়রা চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার একটা বড় সুযোগ পেল।

৬.৭ আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঃ আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করতে পারবে এবং সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং পরিষদ উহার মালিকানাধীন বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করতে পারবে। এক অর্থ বৎসর শুরু হবার পূর্বে পরিষদ উক্ত অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরনী বাজেট হিসেবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করতে পারবে। পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করতে পারবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারবে। তাছাড়া পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কালে অসুস্থ হয়ে বা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে পরিষদ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার বর্গকে গ্রাচুইটি প্রদান করতে পারবে। পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হবে।[১১৯] যথা ঃ

(ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ।

(খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ।

(গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিকল্পিত সকল হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পর দীর্ঘ মেয়াদে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হবে বলে কতজন মনে করে:

উপজাতি	ভালো হবে	ভালো হবে না	অপরিবর্তিত থাকবে
চাকমা	৬০%	২৬%	১৫%
মারমা	৫৮%	২৮%	৩০%
ত্রিপুরা	৬৬%	২৯%	৩৭%
অন্যান্য	৫৫%	২৪%	২১%

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতামত ঃ

উপজাতি	ব্যাপক বিনিয়োগ হবে	বিনিয়োগ হবে না	অপরিবর্তিত
চাকমা	৭৩%	২০%	৭%
মারমা	৬০%	২৬%	১৪%
ত্রিপুরা	৫৮%	২৯%	১৮%
অন্যান্য	৬২%	২৮%	২০%

ব্যবসায় লাইসেন্স এবং চাকুরী প্রদান করবে আঞ্চলিক পরিষদ। আর আঞ্চলিক পরিষদে উপজাতীয় সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিশাল ক্ষেত্র তৈরী করে নিয়েছে উপজাতীয়দের জন্য যা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। আঞ্চলিক পরিষদের আদায়কৃত অর্থের উদ্ধৃত্ত অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত হলে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং আয় বেড়ে যাবে। শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সামাজিক সুবিধা বাড়বে। এছাড়া দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পর্যটন, ফল প্রক্রিয়াকরণ, আসবাবপত্র নির্মাণ, মিঠাপানির মৎস্য প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ, চা ও রাবার বাগান এবং খনিজ সম্পদ আহরণে ব্যাপক বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ি জনগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফলে অনড়, সাধারণ এবং সনাতনী সামাজিক জীবন প্রণালী পরিবর্তিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গতিশীল আধুনিক জীবনের দিকে ধাবিত হবে পাহাড়ি জনগণ। এর ফলে সনাতন ধর্মীয় ও আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাত অথবা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে দেখা দিবে।

৬.৮ উপজাতীয়দের উন্নয়ন ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে ঃ ভারী শিল্প স্থাপন এবং খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরনে তাদের বিশেষভাবে সুযোগ দিতে হবে। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে বেশী অর্থ আসবে। সেই অর্থ তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ করে উপজাতীয়দের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে ব্যয় করতে পারবে।

৬.৯ শরনার্থী সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে ঃ এ চুক্তির ফলে শরনার্থীরা দেশে ফিরে আসার সুযোগ পেল। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনবার্সনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফলে তাদের পরিবার ব্যবস্থা সুসংহত ও সামাজিক সম্পর্ক সুবিন্যস্ত হবে।

৬.১০ সামাজিক ক্ষেত্রে ঃ সনাতন উৎপাদন প্রণালীর অস্তিত্ব থাকায় এবং ভোগভিত্তিক অর্থনীতির উপস্থিতির কারণে সামাজিক গতিহীনতা যে মাত্রায় বিরাজমান ছিল চুক্তিজনিত আধুনিকতার প্রভাবে তা পরিবর্তিত হয়ে অর্থাৎ সামাজিক গতিশীলতা বাড়বে। পরিবর্তিত হবে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূল্যবোধের। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে উপজাতিগুলো আধুনিকতার অভিযাতে কিছুটা হলেও অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ পার্বত্য শান্তি চুক্তির অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের যে প্রান্তিক অবস্থান তা পরিবর্তিত হয়ে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সমান্তরাল হয়ে উঠতে পারে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতামতঃ

উপজাতি	উন্নয়ন দ্রুততর হবে	উন্নয়ন হবে না	অপরিবর্তিত
চাকমা	৫০%	২৮%	২২%
মারমা	৬২%	২৪%	১২%
ত্রিপুরা	৪৮%	৩১%	২৮%
অন্যান্য	৫২%	২২%	২৬%

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১ শিক্ষাক্ষেত্রে ঃ এ চুক্তির ফলে উপজাতীয়রা শিক্ষাক্ষেত্রে লাভবান হবেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষা ও চাকুরীতে কোটা এবং বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতায় ঢোকার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

৬.১২ সামরিক নেটওয়ার্ক ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা হয়েছে ঃ সংহতি সমিতির সদস্যদের ৪৫ জনের মধ্যে অস্ত্র জমা দিতে বলা হয়েছে যারা এর মধ্যে জমা দিবে তাদের সাধারণ ক্ষমা এবং তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় মামলা প্রত্যাহার করা হবে। তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হবে। পূর্বের ঋণ মওকুফ করা হবে। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার সুযোগ করে দেয়া হবে। ফলে তারা সামরিক নেটওর্য়াক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস ও জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

৬.১৩ কৃষ্টি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঃ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র্যতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবে। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবে। ফলে উপজাতীয়রা আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি লালন করতে পারবে পার্বত্য জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত হলে বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও বিদেশী সংস্কৃতির অনেক উপাদান তাঁদের সংস্কৃতির মধ্যে মিশে যাবে। ফলে পার্বত্য উপজাতিদের সংস্কৃতির যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তা বিলীন না হলেও পরিবর্তিত হবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ নিয়ে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতামত:

উপজাতি	সংরক্ষিত হবে	ধ্বংস হবে	অপরিবর্তিত
চাকমা	৫৩%	৩৩%	১৪%
মারমা	৬২%	২২%	১৬%
ত্রিপুরা	৭৫%	২০%	৬%
অন্যান্য	৩৭%	২৭%	৩৬%

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৪ শান্তি চুক্তির নেতিবাচক দিক

পাহাড়ীরা বেশী সুযোগসুবিধা পেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের মধ্যে বঞ্চনার চেতনা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যে এর কিছু প্রমান পাওয়া গেছে। ভূমি সংক্রান্ত জেলা পরিষদ বিষয় আইনে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা একাধারে সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের সম্পূর্ণ বরখেলাপ। সংবিধানের ১৪৩ ও ১৪৪ নং ধারায় প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি সম্পর্কে বিধান রয়েছে। এ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি, যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী এ সব কিছুরই মালিক রাষ্ট্র।[১১৯]

কিন্তু জেলা পরিষদসমূহের আইনে “পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে” যে কোন জায়গা-জমি ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা বিধি-বহির্ভূত করা হয়েছে। (৬৪ (ক) ধারা) অনুরূপভাবে জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে" সরকার অধিগ্রহণ বা হস্তান্তর করতে পারবে না। এমন বিধান করা হয়েছে যা স্পষ্টত:ই সংবিধানের ১৪৩ ও ১৪৪ ধারার পরিপন্থী।[১২০]

চাকুরীতে নিয়োগের বিধানও প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব বিরোধী। আইনে পার্বত্য ৩টি জেলা পরিষদকে একটি পর্যায় পর্যন্ত সকল কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পর্যায়ের উপরের স্তরে কোন কর্মকর্তা যদিও সরকার নিয়োগ দিতে পারবে এরূপ বিধান করা হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তা কেবলমাত্র পরিষদের সহিত পরামর্শে হতে হবে। সংবিধানে বর্ণিত “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান” এরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও তা অ-উপজাতিয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কারণ দেখা যাচ্ছে যে,

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বভাবতঃই এ এলাকার অ-উপজাতীয় যাঁরা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবেন।

(খ) নতুন আইনে অ-উপজাতীয়দের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বাসিন্দা হিসাবে কেবলমাত্র তখনই গন্য করা হবে যখন তাঁদের উক্ত এলাকায় জায়গা-জমি থাকবে। অথচ উ-পজাতীয়দের বেলায় এরূপ কোন বিধি-নিষেধ বা বিধান নেই। এর ফলে অন্য দেশ থেকে উ-পজাতীয়রা দলে দলে এসে হাজির হলেও তারা এদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হবেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, এরূপ ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটছে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ যথাক্রমে ২৫ জন ও ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে অ-উপজাতীয়দের প্রতিনিধি থাকবে জেলা পরিষদে ৭ জন ও আঞ্চলিক পরিষদে ১১ জন। অর্থাৎ অ-উপজাতীয়দের প্রতিনিধি সংখ্যা হবে এক তৃতীয়াংশের কম, যদিও তাঁরা সংখ্যায় প্রায় অর্ধেক। এছাড়া ঐ সব সংস্থার কথাও অ-উপজাতীয়রা চেয়ারম্যান পদ লাভ করতে পারবে না। স্পষ্টত:ই এ সব আইন সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সাথে সংঘাতমূলক।

(ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানে ২৯ ধারায় নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করবেন এবং কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদে বা জন্ম স্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের ফলে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য বিবেচিত হবেন না এরূপ বিধান রয়েছে। অতএব এ নতুন আইনে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান স্পষ্টত:ই সংবিধান বিরোধী।

তাছাড়া এ চুক্তির ফলে কোন বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী কিনা তার জন্য উপজাতীয় সার্কেল চীফের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে।
পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য যে মন্ত্রনালয় গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে তার মন্ত্রী হবেন একজন উপজাতীয়। উপদেষ্টা হবেন ১৪ জন তার মধ্যে বাঙ্গালী হবেন মাত্র ৩ জন।[১২১]

এ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর (৬০%) সংগে সেখানকার অ-উপজাতীয় তথা সমগ্র বাংলাদেশীকে একটি মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। যে সমস্যাটা একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তা জাতীয়ভাবে বিস্তৃত হচ্ছে।

কিন্তু তবুও এ চুক্তির ফলে যতটুকু স্থানীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতিক্রিয়া ঃ

৬.১৫ পার্বত্য উপজাতীয়দের প্রতিক্রিয়া ঃ

পক্ষে ঃ জনসংহতি সমিতি এ চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। যদিও তারা তাদের দাবীর পূর্ণ বাস্তবায়ন শান্তি চুক্তিতে হয়নি বলে দাবী করে, কিন্তু তারা যতটা না গুরুত্ব দিচ্ছে চুক্তির উপর। তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে এর সঠিক বাস্তবায়নের উপর এর স্বার্থকতা নির্ভরশীল বলে মত ব্যক্ত করেন।

বিপক্ষে ঃ প্রসিত সঙ্কর গ্রুপ ঃ চুক্তিটিকে মূলত: প্রহসন, কালো পতাকা প্রদর্শন,সংহতির প্রদর্শন, সংহতির মূলে কাটা অর্থাৎ স্বায়ত্বশাসনের পথ থেকে সরে আসা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারণা এতে পাহাড়ী জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবেনা। তাই এ চুক্তি তারা প্রত্যাখান করে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলাফল নিয়ে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতামত

উপজাতি	ইতিবাচক	নেতিবাচক	অপরিবর্তিত
চাকমা	৬২%	২৮%	২০%
মারমা	৫৮%	৩০%	১২%
ত্রিপুরা	৭৩%	২০%	৭%
অন্যান্য	৫০%	২২%	২৮%

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৬ পাহাড়ী বাঙ্গালীদের প্রতিক্রিয়া ঃ

পাহাড়ে বসবাসকারী পুরানো অভিবাসির খুব অসুখী না হলেও নতুন অভিবাসী বাঙ্গালীরা এ চুক্তির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধীতা শুরু করেছেন। তারা এ চুক্তিকে সংবিধান বিরুদ্ধ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা এ চুক্তির বিপরীতে সভা সমাবেশ ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে তাদের বিরোধীতা প্রকাশ করছে। এমনকি আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের দাবী আদায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থক বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া

৬.১৭ আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া ঃ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমি দারুণ খুশি হয়েছি। দীর্ঘদিনের পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথ অবারিত হয়েছে"।

আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, আমি খুব আনন্দিত দীর্ঘদিনের সমস্যা অবশেষে সমাধান করতে পেরেছি।

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, 'আমরা সামরিকভাবে যে বিবাদরত ছিলাম সে বিবাদের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি'।

৬.১৮ আওয়ামী লীগ সমর্থক বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিক্রিয়া ঃ মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, যুব, ছাত্র, শিক্ষক-কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিকে স্বাগত ও অভিনন্দিত করেছেন।

সংগ্রামী নারী সমাজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন; "এই চুক্তি দেশের জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা, সকল জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে বহুমাত্রিক প্রভাব বয়ে আনবে"।

৬.১৯ আওয়ামী লীগ সমর্থিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া ঃ সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদ পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে ঐতিহাসিক চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১২২]

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দ্র মজুমদার বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের একটা সমস্যার সমাধান হলো'।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ডঃ কাজী খালেকুজ্জামান আহমেদ চুক্তি সম্পর্কে বলেন, 'আমি এ চুক্তিকে স্বাগত জানাই এবং এর দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বর্তমান সরকারের বড়ো ধরনের একটা সাফল্য'।

৬.২০ বি,এন,পির প্রতিক্রিয়া ঃ বি, এন,পি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এ চুক্তিকে অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন- এ চুক্তির ফলে দেশের কিছু অংশ ভারত নিয়ে যাবে এবং চট্টগ্রামে কোন বাঙ্গালী থাকতে পারবে না। তার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও এ চুক্তি প্রতিহত করার কথা বলেন।

৬.২১ বি,এন,পি সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া ঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, 'পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধান সম্মত নয়'। এবনে গোলাম সংসদে বলেন, 'শান্তি চুক্তি এর এটা নিঃশর্ত আত্মসমর্পন'।[১২৩]

সাদেক খান তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন নয় বরং শান্তি প্রক্রিয়ার কবর রচিত হয়েছে"।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণ তাঁদের অস্তিত্বের শেকড় খুঁজতে খুঁজতে আইনগত অধিকার থেকে একের পর এক বঞ্চিত হয়েছে। পার্বত্য পাহাড়ী জনগণের বিধিবদ্ধ আইনগত অধিকার একের পর এক হরণ করেছে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী।

১৯৪৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়া এবং ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা উপেক্ষা করাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার নতুন যাত্রা সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার দাবী জানিয়েছিল স্বাধীনতা উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগণ। কিন্তু তাদের দাবীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। অধিকারহারা পাহাড়ী জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুদীর্ঘ দুই যুগ ধরে লড়াই সংগ্রাম করেছে। ১৯৯১ সালে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তৎকালীন সরকার সংসদীয় কমিটি গঠন করে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা শুরু করে এবং পাঁচ বৎসর সময়কালে সমস্যা সমাধানের জন্য তেরো বার বৈঠক করে। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার এ ধারা অব্যাহত রাখে এবং আলোচনা সফল হলে গত ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

পার্বত্য জেলাসমূহে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী শাসন ব্যবস্থা। পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের প্রয়োজনে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে। ১৯০০ সালের Regulation অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসিত হয়ে আসছিল। বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলায় (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন ১৯৮৯ সালের ১৬ নং আইন জাতীয় সংসদে প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের ১ (২), ৩ ও ৪ ধারা অনুসারে Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 রহিত এবং পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইন প্রয়োগ ও ঐ সকল জেলাসমূহের জন্য কিন্তু বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল। এ আইন

Dhaka University Institutional Repository

২রা মার্চ ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয়নি। সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা স্মারক বিকা (কল্যাণ) ম-৭ (৯১/৯০ (প্রঃ)/২৭ তারিখ ২৯/১০/৯০ইং বিষয় Chittagong Hill Tracts Regulation 1900" কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী জানাচ্ছে যে, পার্বত্য জেলাসমূহে (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) ১৯৮৯ প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইনের ১(২) নং ধারাতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখে নির্ধারণ করবে সে তারিখ হতে এ আইন বলবৎ হবে।

বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের কার্যক্রম চালু হওয়ার পরও Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 বহাল থাকার কারণে জেলার ও পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা, বিচার বিভাগ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থানীয় বিশেষ শাসন ব্যবস্থার বাইরে থেকে যায়। Regulation অনুসারে জেলা প্রশাসকের সাথে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের আইনগত কোন সম্পর্ক নেই এবং Regulation এর আওতায় পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের কাছেও জেলা প্রশাসকের কোন প্রকার দায়বদ্ধতা নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় দ্বারা উপজেলা পরিষদ পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম Regulation বলবৎ থাকার কারণে। পার্বত্য অঞ্চলে প্রবর্তিত নতুন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা হিসেবে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থবহ এবং শক্তিশালী করার স্বার্থে উপজেলা পরিষদ পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ আইন/অধ্যাদেশসমূহ সংশোধন করা বিশেষ প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হলো মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত বিষয়াবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৮ ধারা মতে এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইনে ৪৫ ধারা মতে কোন প্রকার বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলীকে অর্থবহ করার জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কোন ভূমিকা না থাকায় কার্যাবলী তালিকার ব্যাপারে অস্পষ্টতা, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত দফতরসমূহের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণহীনতা স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহকে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ও আইনসমূহ সংশোধন না হওয়ার কারণে এবং মন্ত্রণালয়ের কার্য বন্টন তালিকায় ক্ষমতার এখতিয়ার সম্পর্কে কোন প্রকার পরিষ্কার নীতিমালা না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে পোস্ট বক্সের ভূমিকা পালন করছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারায় বর্ণিত ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিষদ আইনের ২৩(খ) ধারা মতে পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত না হলেও ২২ ধারা মতে পরিষদের কার্যাবলী প্রথম তফসিলের ১০(গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাট-বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় ১৯৩৭ সালের বাজার ফান্ড ম্যানুয়াল বাজার ফান্ডের অধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা পরিষদের নিকট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ভূমি মন্ত্রণালয়, শাখা- ৯ প্রজ্ঞাপন নং ভূঃ মঃ/ শাখা-৯/১৬/৮৫-৫৮১ তারিখ ১৯/৭/১৯৮৯ইং হস্তান্তর করে। ১৯৩৭ সালের বাজার ফান্ড ম্যানুয়েল অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ তার হস্তান্তরিত দফতর হিসেবে বাজার ফান্ডের পরিচালনাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন হাট-বাজার ইজারা প্রদান করে আসছে। ফলে স্থানীয় হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থের মালিকানা নিয়ে পরিষদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন অনেক আইন আছে যা সমগ্র দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রযোজ্য হলেও তা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার প্রযোজ্য নয়। আবার এমন অনেক আইন আছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য হলেও সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহে কার্যকর নয়। যেমনঃ মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ কে পার্বত্য চট্টগ্রাম Regulation এর ৪(২) অনুচ্ছেদ মতে পার্বত্য জেলাসমূহে ঘোষণা করা হয়নি। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম Regulation ৪(২এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্বত্য জেলাসমূহে অন্য কোন আইন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কিংবা ব্যাপ্তি বা সংশোধনীসহ প্রয়োগ করতে হলে সরকারকে অবশ্যই সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহে কার্যকর ঘোষণা করতে হবে। তাছাড়া দেওয়ানী কার্যবিধি আইন (ন ১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) তিন পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের (১৯৮৯ সালের ১৯, ২০, ২১নং আইন) ১৩(২) ধারা অনুসারে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য নির্বাচনের পর পরিষদ আইনের ৫ বা ৬ ধারা -এর অধীনে অযোগ্য হয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে কোন প্রকার বির্তক দেখা দিলে, নিস্পত্তির জন্য পার্বত্য জেলা জর্জের মতামতের জন্য প্রেরণের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে; কিন্তু পার্বত্য জেলাসমূহে কোথাও জেলা জর্জের ব্যবস্থা নেই।

আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(ঙ) ধারার বলা হয়েছে "উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করা আঞ্চলিক পরিষদের অন্যতম কাজ" যদিও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২৩(খ) ধারা মতে ২২ ধারায় বর্ণিত ১ম তফসিলের ২৩ নং কার্যাবলী উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার অদ্যাবধি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করা হয়নি। ফলে পরিষদ আইনের ৬৬(৪) ধারায় বর্ণিত বিষয় ৬৯ ধারা মতে পরিষদ অদ্যাবধি বিচার পদ্ধতি, বিচার প্রার্থী ও আপীল কারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস নির্ধারণ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারেনি। ফলে উপজাতীয়দের মধ্যে সৃষ্ট সামাজিক অনাচার বন্ধে পরিষদ কোন প্রকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

উপরোল্লেখিত চুক্তির এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা চুক্তির ফলে ক্ষমতায়ন, ভূমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধাও পেয়েছে। চুক্তির ফলে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ী বাঙ্গালী সবাই অবাধে চলাফেরা করতে পারছে। পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাত করতে পারছে। শান্তি বাহিনীর উপস্থিতির কারণে এতদিন এখানে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটতো, এখন সে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে এবং শান্তি বাহিনীই এখন মূল কর্মকান্ডের নেতৃত্বে এসেছে। পার্বত্য অঞ্চলের সকল কর্তৃত্ব ও উন্নয়নের ভার তাদের নেতাদের হাতে অর্পিত। সুতরাং রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে ঐ অঞ্চলে অস্থিরতা যেমন দূর হয়েছে তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই সরকার পার্বত্য অঞ্চলকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার এক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও তার যথাযথ ব্যবহারের জন্য দাতা গোষ্ঠীর সাথে সংলাপ শুরু হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন,

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রশাসন প্রভৃতি উপজাতীয়দের হাতে অর্পণ করায় তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে। সরকার ভূমি বন্টন, পুর্নবিন্যাস, প্রশাসনিক সংস্কার, স্থানীয় সরকার গঠন ও বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠনের মতো যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এসব উন্নয়ন কর্মকান্ডে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের যৌথ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া উপজাতি সংস্কৃতির মিশ্রণ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে একীভূতকরণের ফলে উপজাতীয়রা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের চাকরি, শিক্ষা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোটা নির্ধারণ ও পার্বত্য অঞ্চলে এ ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সুবিধা দানের ফলে তারা অগ্রসর জাতিতে পরিনত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে সকল জনশক্তির সুষ্ঠু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। পাহাড়ী 'বাঙ্গালী' জাতি বিভক্তির এই স্লোগান থেকে বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বা মুক্তি পেয়েছে। দেশের সকল নাগরিক সমান মর্যাদার অধিকারী এবং জাতীয় উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহনের ফলে দেশের আরেক ধাপ অগ্রগতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি একটি অনিবার্য রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী এবং সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ আহরণ ও শ্রমশক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ফলে "বাণিজ্য অর্থনীতি" সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অপরিহার্য বস্তুগত প্রয়োজন পরিপূরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। আহমেদ ছফা : শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ, ঢাকা, ইনফো পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৩৭-৩৯।

২। সাপ্তাহিক একতা : পাবর্ত চট্টগ্রাম সমস্যা পর্যালোচনা, ঢাকা, ১ জানুয়ারী ১৯৯৮।

৩। ফেরদৌস হোসেন : পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-কৌশলগত অবস্থানও নিরাপত্তা, ঢাকা, বইপাড়া, প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯-২১।

৪। হুমায়ুন আজাদ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৯-২১।

৫। সিদ্ধার্থ চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামে, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৭-৪৮।

৬। সুবোধ ঘোষ : ভারতের আদিবাসী, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৪-৫।

৭। আব্দুস সাত্তার : আরণ্য সংস্কৃতি, ঢাকা, মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৪-৫।

৮। সুগত চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, রাঙামাটি, ট্রাইবাল অফিসার্স কলোনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪০-৭২।

৯। ডেভিড সোফার : পপুলেশন ডিসলোকেশন ইনদ্যা হিল্ ট্রাক্টস্ দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ-৫৩, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৬২।

১০। ডব্লিউ হান্টার : এস্ট্যাটিষ্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, নিউ দিল্লী, ডি চক পাবলিশিং হাউস, ভল্যুম ৬, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা৮৩-৯৫।

১১। সৈয়দ নাজমুল আহসান ও ভূমিত্র চাকমা : প্রবলেমস্ অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন বাংলাদেশ, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্, এশিয়া সার্ভে, ভল্যুম ২৯, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১২। এফ কে খান এন্ড এ এল খীসা : শিফটিং কালটিভেশন ইন ইস্ট পাকিস্তান, ওরিয়েন্টাল জিওগ্রাফার-১৪, ১৯৭০, পৃষ্ঠা - ২২-৪৩।

১৩। অমরেন্দ্র লাল খীসা : পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষ : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮২।

১৪। হাবিবুর রহমান : পার্বত্য বাংলাদেশের জুম চাষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, ১৯৮৮।

১৫। খান ও খীসা : পূর্বোক্ত।

১৬। হাবিবুর রহমান : পূর্বোক্ত।

১৭। আর এইচ এস হাচিনসন : চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্, দিল্লী বিবেক পাবলিশিং, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-১৩-২৭।

১৮। আহসান ও চাকমা : পূর্বোক্ত।

১৯। আর এইচ হাচিনসন : পূর্বোক্ত।

২০। আলমুট মে. দি ইকোনমি অব শিফটিং কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ, মিমি ও বার্লিন ১৯৭৮।

২১। সৈয়দ নাজমুল ইসলাম : দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ ইন বাংলাদেশ, ইন্টিগ্রেশনাল ক্রাইসিস বিটুইন সেন্টার এন্ড রেফেরী এশিয়া সার্ভে, ভল্যুম ২১ নং ১২, ১৯৮১।

২২। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিসংখ্যান : বি.বি.এস, ঢাকা, ১৯৮৩।

২৩। আর আই চৌধুরী এন্ড ব্রাদার্স : ট্রাইবাল লীডারশীপ এন্ড পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, চিট্টগাং ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯।

২৪। আবুল বারকাত এন্ড সামসুল হুদা : পলিটিক্যাল ইকোনমিক এসেন্স অব এথনিক কনফ্লিক্টস্ ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ অব বাংলাদেশে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, সোসাল সায়েন্স রিভিউ ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। কজী মন্টু : ট্রাইবাল ইমার্জেন্সি ইন চিটাগাং হিল ট্যাক্টস্, ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম ১৫ নং ৩৬, ১৯৮৭।

২৬। স্বাধীনতা দেওয়ান : বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসন্তোষের ইতিকথা, লাড়োই, ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯০, পৃষ্ঠা- ৭২-৭৬।

২৭। নির্মল কান্তি ঘোষ : ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২২৫।

২৮। ড. মিজানুর রহমান শেলী : দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ অব বাংলাদেশ, দি আনটোল্ড স্টোরী, ঢাকা, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৮৩।

২৯। আজিজুল হক : বাংলাদেশ ইন ১৯৮১, স্ট্রেইনস্ এন্ড স্ট্রেস, এশিয়ান সার্ভে, ভল্যুম ২১ নং ২, ১৯৮৮।

৩০। সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৩১। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা: রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, অন্বেষা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২৩-২৭।

৩২। সি আর চাকমা : যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি, ভারত, নিলুয়া, হাওড়া, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬৭।

৩৩। বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান : চাকমা জাতির ইতিকথা, বান্দরবান, ঝরণা, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬৯।

৩৪। অশোক কুমার দেওয়ান : চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার, খাগড়াছড়ি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৫০-৫১।

৩৫। রিন্টু চাকমা : পার্বত্যবাসীদের অসন্তোষের কারণসমূহ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রসংগ, রাঙামাটি, বৈশাখী, ১৩৯৭।

৩৬। শওকত আরা হোসেন : বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা, হিল রিভিউ, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। খাজা কামরুল হক : বাংলাদেশের উপজাতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

৩৮। কপেল ফেইর : জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪, পৃষ্ঠা ২০১-২০২।

৩৯। এস, এইচ হাচিনসন : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯।

৪০। ডব্লিউ হান্টার : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

৪১। সুগত চাকমা : চাকমা পরিচিতি, রাঙ্গামাটি, বরগাও পাবলিকেশন্স, ১৯৮৩।

৪২। সুপ্রিয় তালুকদার : চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ, রাঙ্গামাটি, বরগাও পাবলিকেশন্স, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৬।

৪৩। মোহাম্মদ আব্দুর রব : পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, প্রবন্ধ, ঢাকা অতন্দ্র জনতা।

৪৪। জাফর হানাফী : বোমাঙ রাজা, রাঙ্গামাটি, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইউনিট, ১৯৮৯।

৪৫। আব্দুল সাত্তার : চাকমা আদিবাসী নয় বহিরাগত, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! -এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, ঢাকা, অতন্দ্র জনতা।

৪৬। লাইফ ইজ নট আওয়ার্স : লেও এন্ড হিউম্যান রাইটস্, দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ অব বাংলাদেশ, রিপোর্ট অব দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ কমিশন, ১৯৯১। পৃষ্ঠা-২২।

৪৭। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েল বুক ডিপোট, কলকাতা, ১৯৯৪।

৪৮। এস মাহমুদ আলী : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৯৯।

৪৯। এস মাহমুদ আলী : ঐ

৫০। বদরুদ্দীন উমর : পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম, ঢাকা, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। বিরাজ মোহন দেওয়ান : চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১৫৪।

৫২। বিরাজ মোহন দেওয়ান : পূর্বোক্ত

৫৩। প্রদীপ্ত খীসা : পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩৩।

৫৪। জনসংহতি সমিতি : এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্, ১৯৮২, পৃঃ৩-৪।

৫৫। সৈয়দ নাজমুল আহসান ও ভূমিত্র চাকমা : পূর্বোক্ত।

৫৬। প্রদীপ্ত খীসা : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৬।

৫৭। ফেরদৌস হোসেন : পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র, সংখ্যা-৩, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৯৭-১১৮।

৫৮। বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্, অধ্যায়-৬, ১৯৭৫।

৫৯। এম. আই. চৌধুরী : কাপ্তাই ডেম এন্ড হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি, বাংলাদেশ অবজারভার, ২৭ মে, ১৯৭৪।

৬০। আহমেদ মুসা : শান্ত অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম, মাসিক নিপুন, জুন ১৯৮৫।

৬১। সৈয়দ নাজমুল আহসান ও ভূমিত্র চাকমা : পূর্বোক্ত।

৬২। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪৬।

৬৩। আজিজুল হক : 'বাংলাদেশ ইন ১৯৮১, স্ট্রেইনস এন্ড স্ট্রেস', এশিয়ান সার্ভে, ভল্যুম-২১ নং ২।

৬৪। মিজানুর রহমান শেলী : পূর্বোক্ত।

৬৫। চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ কমিশন : পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬। জনসংহতি সমিতি : তথ্য ও বিচার বিভাগ, স্মরণিকা প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৮৫।

৬৭। আনু মুহাম্মদ : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধা কোথায়, ঢাকা, প্রিয় প্রজন্ম ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৪২-৫২।

৬৮। সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

৬৯। তিন সংসদ সদস্য শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্র লাল চাকমার সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৫ এপ্রিল ১৯৮০।

৭০। দি উইকলি গার্ডিয়ান : লন্ডন, ২৮ এপ্রিল ১৯৮১।

৭১। বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১-১৩।

৭২। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতানিত্রক সংগ্রাম, কলকাতা ডিএনবিন ব্রাদার্স ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৬৬-৭১।

৭৩। দেশ প্রিয় চাকমা : Existance, ঢাকা, ট্রাইবাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯২, পৃষ্ঠা-৮-৯।

৭৪। বদরুদ্দীন উমর : পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা - ২১

৭৫। স্বাধীনতা দেওয়ান : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২০।

৭৬। বিপ্লব চাকমা : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৯।

৭৭ সাপ্তাহিক রোববার : ঢাকা, ২০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭।

৭৮। প্রদীপ্ত খীসা : পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৫৫।

৭৯। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৭০।

৮০। সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৮১। জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র-১ : (জুম্ম জনগণের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পাব্যত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবীনামা।

৮২। জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র-২ : (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় সংসদে আনীত পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল এর উপর জনসংহতি সমিতির বিবৃতি।)

৮৩। জুম বিজয় চাকমা : পার্বত্য জেলা নির্বাচন, অত:পর দি মেইন স্ট্রিম, ঢাকা, অনিয়মিত সংকলন, ১৯৯০।

৮৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ঢাকা, ২৭ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৯০।

৮৫। ড. আব্দুল করিম : জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ভল্যুম ৮, নং ২, ১৯৬৩।

৮৬। প্রশান্ত ত্রিপুরা : দি কলোনিয়াল ফাউন্ডেশন অফ পাহাড়ী এথনিসিটি, জার্নাল অফ সোসাল স্টাডিস, অক্টোবর ৫৮, ১৯৯২।

৮৭। বরেণ ত্রিপুরা : ত্রিপুরা জাতি, সাপ্তাহিক পার্বতী, ২৩ নভেম্বর ১৯৯১।

৮৮। সজল বসু : আঞ্চলিক আন্দোলন, কলকাতা, অর্পনা বুক ডিস্টিবিউটার্স, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭-১০।

৮৯। সিদ্ধার্থ চাকমা : প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, কলকাতা, মল্লিকপুর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-২৫-৩০।

৯০। সিদ্ধার্থ চাকমা : প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স।

৯১। সুবোধ ঘোষ : পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-৬০।

৯২। সুনীতি বিকাশ চাকমা : 'প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, এখনো, ষড়যন্ত্র', চট্টগ্রাম, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৩।

৯৩। এম কামরুজ্জামান : পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট, উপজাতীয় ও সংহতি, ঢাকা, প্রাক্সিস জার্নাল, সংখ্যা ২২, ১৯৮৬।

৯৪। সিদ্ধার্থ চাকমা : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫। চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯৭১।

৯৬। সিদ্ধার্থ চাকমা : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১-১২।

৯৭। চিন্ময় মুৎসুদ্দী : অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৪-১৮।

৯৮। সি আর চাকমা : যুগ বিবর্তনে চাকমা জাতি, হাওড়া, নব চন্দ্র বই ছাভানী সংস্থা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২১।

৯৯। কামিনী মোহন দেওয়ান : পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের কাহিনী, রাঙ্গামাটি, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৯৭।

১০০। চিন্ময় মুৎসুদ্দী : পূর্বোক্ত।

১০১। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৫-৫০।

১০২। বিপ্লব চাকমা : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে', ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭।

১০৩। মাহফুজ পারভেজ : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, বিকল্প মানবিক সমাধান', চট্টগ্রাম, দৈনিক পূর্বকোন, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯।

১০৪। মাহফুজ পারভেজ : পার্বত্য সংকটের নানা যাত্রা ও ভবিষ্যৎ, চট্টগ্রাম, দৈনিক পূর্বকোন, ১০ আগস্ট, ১৯৯৮।

১০৫। মাহফুজ পারভেজ : সম্ভাবনার দুই দিগন্ত, চট্টগ্রাম, দৈনিক পূর্বকোন, ৩ আগস্ট, ১৯৯৮।

১০৬। পাপড়ি : একটি অশান্ত ভূগোলের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাপ্তাহিক বিচিন্তা, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১০৭। জুম বিজয় চাকমা : পার্বত্য চ্টগ্রাম সমস্যা ও সম্ভাবনা, সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৫-৫০।

১০৮। পি সি দেওয়ান : ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাপ্তাহিক সুগন্ধা, ২৫ মার্চ, ১৯৯১।

১০৯। মাহফুজ পারভেজ : একবিংশ শতকের পদধ্বনি, পাক্ষিক শৈলী, ঢাকা ১ জুন, ১৯৯৮।

১১০। মাহফুজ পারভেজ : জাতীয়তাবাদের রাজনীতি, বাংলা বাজার পত্রিকা, ঢাকা, ৬ মে, ১৯৭৮।

১১১। মোঃ নূরুল আমিন ও অন্যান্য : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৯৯২।

১১২। মোঃ শাহ আলম : বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজ পাঠ, চট্টগ্রাম, ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম, আইন অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

১১৩। রশীদ উন নবী : সরকারী শান্তি নিয়ে অশান্তি সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ঢাকা ১৩ মে, ১৯৯৮।

১১৪। আব্দুর রহমান খান : পার্বত্য চট্টগ্রাম কি ঘটছে? পাক্ষিক পালাবদল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৯১।

১১৫। এম কামরুজ্জামান : পার্বত্য চট্টগ্রামে সংকট, উপজাতীয়তা ও সংহতি, প্রাক্সিস জার্নাল, সংখ্যা ২২, ঢাকা, ১৯৮৬।

১১৬। শামসুল আলম : পার্বত্য চট্টগ্রামে আনন্দ মিছিল ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া, আজকের কাগজ, ৪ ডিসেম্বর, ঢাকা ১৯৯৭।

১১৭। মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা, জসিম উদ্দিন আহমদ, সাঈফ উর রহমান : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ বইপাড়া, শাহাবাগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৯৪-১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১৮। শাহরিয়ার কবির : শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অনুপম প্রকাশনী ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৭৩-৯০।

১১৯। মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা : পাব্যত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন ও বাংলাদেশের সংবিধান, বইপাড়া, শাহাবাগ প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৮৮-১০০।

১২০। ওয়াদুদ ভূঁইয়া : 'পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিরোধ, কালোচুক্তি মানি না', ঢাকা, সাপ্তাহিক পূর্নিমা ৩ জুন ১৯৯৯।

১২১। সালিম সামাদ : পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ।

১২২। মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা : পূর্বোক্ত।

১২৩। এডভোকেট প্রতিম রায় পাম্পু : 'পার্বত্য আইন, তত্ত্বে ও প্রয়োগে', রাঙ্গামাটি প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ণ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

২। মাহফুজ পারভেজ : বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি, ঢাকা, সন্দেশ প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৩। বিপ্লব চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৭

৪। ফেরদৌস হোসেন : পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা, প্রবন্ধাবলী, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, সংখ্যা-৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। আতিকুর রহমান : প্রেক্ষিত: পার্বত্য সংকট, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৬। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ, ১৯৯৩।

৭। জয়নাল আবেদীন : পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা, ১৯৯৭।

৮। মোহাম্মদ সা'দাত আলী : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ঢাকা, বনলতা প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৯। সুগত চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, রাঙ্গামাটি, ট্রাইবাল অফিসার্স কলোনী, ১৯৯৩।

১০। সুগত চাকমা : চাকমা পরিচিতি, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৩।

১১। অশোক কুমার দেওয়ান : চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার।

Dhaka University Institutional Repository

১২। খাজা কামরুল হক : বাংলাদেশের উপজাতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

১৩। বিরাজ মোহন দেওয়ান : চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত।

১৪। নূহ-উল-আলম লেনিন : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমুখে শান্তি পারাবার, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

১৫। বদরুদ্দীন উমর : পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম, ঢাকা, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১৬। শাহরিয়ার কবির : শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮।

১৭। আনু মুহাম্মদ : বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও জাতিতে সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিপ্রেক্ষিত।

১৮। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ, ঢাকা, বইপাড়া, শাহাবাগ, ১৯৯৯।

১৯। জসিম উদ্দিন আহমদ, সাঈদ-উর-রহমান ও শাহরিয়ার কবির : শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮।

২০। প্রদীপ্ত খীসা : পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬।

২১। এডভোকেট প্রতিম রায় পাম্পু ও সুনীতি বিকাশ চাকমা : পার্বত্য আইন তত্ত্বে ও প্রয়োগে, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি প্রকাশনী, ২০০১।

২২। রবা বিক্রম চাকমা, চাখোরাই অং মারমা ও আবদুল অদুদ ভূঁইয়া : প্রসংগ পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনো ষড়যন্ত্র ।

২৩। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা : তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা ১৯৯১ইং

Dhaka University Institutional Repository

২৪। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ও মাসুদ মজুমদার : আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক ঢাকা, ১৯৯৭

২৫। প্রাণহরি তালুকদার : চাকমাজাতি ও রাজবংশের ইতিহাস, রাঙ্গামাটি, ১৯৮০।

২৬। এম. এন. লারমা : পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্তশাসন কেন?, রাঙ্গামাটি, ১৯৭২।

২৭। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা : পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিতি, রাঙ্গামাটি, ১৯৭৯।

২৮। আলমুট, মে : দি ইকোনমি অব শিফটিং কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ, মিমি ও বার্লিন ১৯৭৮)

29. R. I. Chowdhuri : Tribal Leadership and Political Integration, Chittagong University, 1979.

30. Clarence T. Maloney : "Tribal of Bangladesh and Synthesis of Beganli Culture", Rajshahi University, Institute of Bangladesh Studies (IBS), 1984.

31. Talukder Muniruzzaman : The Bangladesh Revolution and its Aftermath, Dhaka, BBI, 1980.

32. M. S. Qureshi : Tribal Cultures of Bangladesh, Rajshahi University, Institute of Bangladesh Studies (IBS), 1984.

33. Mizanur Rahman Shelley : The ChittagongHill Tracts of Bangladesh, The untold story, Centre for Development Research Bangladesh (CDRB), 1992.

34. Amena Mohsin : The politics of Nationalism: Te case of the chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Dhaka, 1997.

35. Prof. Pierre Bessaignet : Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts, Dhaka, Asiatic Society of Pakistan, 1958.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

চুক্তি পরবর্তী আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

প্রথমেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, ২৪শে মে ৯৮ তারিখে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) পাশ করে এবং সেটা বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা পৃষ্ঠা ৬১৮১ তারিখ ২৪ মে ১৯৯৮ তে প্রকাশ করে।

অতপর প্রয়োজন হয় ১৯৮৯ সালের আইন সমূহকে সংশোধনী করা, এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২৪ মে ১৯৯৮ তারিখে ১৯৮৯ সালের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন করতঃ নতুন আইন প্রনীত হয় (১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন) এবং সেটা বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা পৃষ্ঠা ৬১৯৯ তারিখে ২৪ মে ১৯৯৮ তে প্রকাশ করা হয়। একই গেজেটে ১৯৮৯ সালের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনকে সংশোধন করে পাশ কর ১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন এবং ১৯৮৯ সনের বান্দরবনে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনকে সংশোধন করে পাশ করা ১৯৯৮ সনের ১১ নং আইনও প্রকাশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

(ক) উপজাতি অ-উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার

১। অ-উপজাতি = ৪৬০,৮৩৩ (৪৩.৪%)

২। উপজাতি = ৫১৩৬২ (৫৬.৬%)

(খ) শিক্ষার হার

চাকমা	৫৬%
মারমা	২০%
ত্রিপুরা	২০%
তঞ্চঙ্গা	২০%
লুসাই	১৫%
বম	১৫%
খুমি	০৫%
বাঙ্গালী	২৮%

সূত্র ঃ আহা পার্বত! আহা চট্টগ্রাম!!! (মাসুদ মজুমদার সম্পর্কিত, ঢাকা ১৯৭ পৃষ্ঠা - ২০২)

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনসংখ্যার শতকরা হিসাব

চাকমা	৬৭.৪৫%
ত্রিপুরা	১২.৮৮%
মগ	৭.৭৮%
অন্যান্য	১.৪৫%
বাঙ্গালী	১০.৪৬%

সূত্র ঃ Dr. Mizanur Rahman Shelley, The Chittagong Hill Trcts of Bangladesh, The untold story, CDRB, Dhaka 1992. P. 45

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আর্থ-সামাজিক প্রকল্প (১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ১৯৯০-৯১ সাল পর্যন্ত)

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক	সেক্টর	১৯৭৫ অর্থবছর থেকে ১৯৮৯-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্প সংখ্যা	মূল্য	১৯৯০-৯১	অর্থবছর প্রকল্প
১	কৃষি	৮৯	৬০.৭৯৪	১	.১৩১
২	যোগাযোগ	১২২	৫৩.৯৭৮	১৬	৪.১২৫
৩	শিক্ষা	১৫৬	৫৫.৯৭১	২৪	৫.৮২৩
৪	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫৮	২৪.৩১১	১৭	৩.৭৭১
৫	নির্মাণ কাজ কালীন কোটা	৩৫	৩১.৩৫২	৩	.৮৫০
৬	সমাজ কল্যাণ	২০৪	৬৫.৬১৯	২০	৪.৩০০
৭	কুটির শিল্প	২৮	৪.৪৯১	--	--
৮	রিজার্ভ ফান্ড	--	--	১	২.০০০
		৬৯২	২৯৫.৫১৬	৮২	২১.০০০
৯	বোর্ডের উন্নয়ন ব্যয়	--	৩৬.১৭০	--	৬.৫০০
		৬৯২	৩৩১.৬৮৬	৮২	২৭.৫০০

সূত্র ঃ Dr. Mizanur Rahman Shelley, The Chittagong Hill Trcts of Bangladesh, The untold story, CDRB, Dhaka 1992. P. 159

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৪

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিন্যাস

ধরণ	পরিমান (একর)
অরণ্য ভূমি	২৯.০২,৭৩৯
চাষ যোগ্য জমি (এর মধ্যে ৫৪০০০ একর কাপ্তাই বাঁধে)	৯৩,০০২
চাষের অযোগ্য জমি	৪৫,০০০
মোটেই চাষাবাদ যোগ্য নয় এমন জমি	১.৭০,৮৯৯
পতিত জমির পরিমান	১০,০০০
পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন বা সর্বমোট জমির পরিমান	৩২,৫৯,৫২০

সূত্র ঃ প্রদীপ্ত খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১২৯।